সাক্ষরতা বুলেটিন

২৯০

শ্রাবণ ১৪২৫
জুলাই ২০১৮

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৯০ শ্রাবণ ১৪২৫ জুলাই ২০১৮

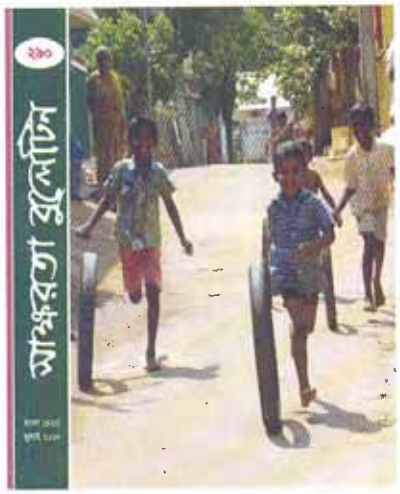

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সূচিপত্র

০৪ **আ. ন. স. হাবিবুর রহমানকে নিবেদিত স্মৃতিভাষ্য**

০৯ **যেহীন আহমদ**
আমাদের হাবীব

১০ **শফিউল আলম**
আ. ন. স. হাবীবুর রহমান: শিক্ষাবিস্তারের আজীবন পদাতিক

১৩ **ম. হাবিবুর রহমান**
ইসিসিডি পরিচালন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

১৭ **আইনুন নাহার বেগম**
একীভূত শিক্ষা: পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

২১ **মো. আব্দুল আজিজ মুন্সী**
বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ও বিশ্ব যুব দিবস

২৩ **আশরাফুন নাহার মিষ্টি**
প্রতিবন্ধী শিশু ও তার পরিচর্যা

২৫ **মাছুম বিল্লাহ**
মানসম্মত শিক্ষা বলতে আমরা কী বুঝি

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

Save the Children
সৌজন্যে : সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ

বিশিষ্ট উন্নয়ন শিক্ষাবিদ আ. ন. স. হাবীবুর রহমান আর নেই। তিনি ছিলেন এদেশে বয়স্ক সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আন্দোলনের এক অগ্রপথিক। বিগত চার দশক ধরে বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও এডুকেশন ওয়াচ-এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষানুরাগী ৪ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান

গণসাক্ষরতা অভিযানের

বেদনার্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি

আ. ন. স. হাবীবুর রহমানকে নিবেদিত স্মৃতিভাষ্য

বয়স্ক সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রপথিক, বিশিষ্ট উন্নয়ন শিক্ষাবিদ আ. ন. স. হাবীবুর রহমান ৪ জুলাই নিউ ইয়র্কে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদেশের সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর হাত ধরে এদেশে গড়ে উঠেছে একদল প্রশিক্ষিত সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকর্মী ও উপকরণ উন্নয়নবিদ। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত দেশের হাজারো সাক্ষরতা-কর্মী। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত গণসাক্ষরতা অভিযানের নানাবিধ কার্যক্রমের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষা উন্নয়নবিদের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। স্থান সংকুলানের জন্য অনেকগুলো লেখায় সম্পাদনা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এজন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।–সম্পাদক

প্রিয় আ. ন. স. হাবীবুর রহমান

আ. ন. স. হাবীবুর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয়, সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সরকার কর্তৃক বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলে আমাদের এ কর্ম-সম্পর্ক আরো গভীর হয়। সরকারি গণশিক্ষা উপকরণ চেতনার অন্যতম লেখক ছিলেন আ. ন. স. হাবীবুর রহমান।

এরপর ১৯৯২ সালে আ. ন. স. হাবীবুর রহমান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ইউনিটে উপ-পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এ সময়ে তাঁর সাথে আমাদের নিবিড় ভাবে কাজ করার সুযোগ ঘটে। তাঁর তত্ত্বাবধানে আহ্ছানিয়া মিশনে রচিত হয় অনেক সাক্ষরতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা কর্মসূচির বিস্তার, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তার অবদান সুবিশাল। তাঁর রচিত শিক্ষা উপকরণ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও গ্রন্থসমূহ যুগ যুগ ধরে এ দেশের সাক্ষরতা কর্মীদের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০০১ সালে তাঁকে চাঁদ সুলতানা সাক্ষরতা পুরস্কারে ভূষিত করে।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর আওতাধীন সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরাম সংগঠন এবং পরিচালনায়ও আ. ন. স. হাবীবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এডুকেশন ওয়াচ-এরও তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়নে তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততা চির-জাগরুক থাকবে আমাদের হৃদয়ে।

আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

কাজী রফিকুল আলম
চেয়ারপার্সন, গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা পর্ষদ

A N S Habibur Rahman, Friend and Educator

Habib and I worked together at Friends in Village Development Bangladesh (FIVDB) in Sylhet for nearly four years from 1980. Together with the FIVDB team, we developed an adult literacy course and training modules for facilitators that have been used by over 300 organisations in Bangladesh. We had the great opportunity of developing a program from the grassroots upward. As we worked together we became good friends as well as colleagues.

After I left Sylhet, Habib took over my role as coordinator of the functional literacy program. Eventually, Habib and his family also moved from Sylhet and Habib went on to work in several other organisations, where he contributed to adult, adolescent and children's education. He became one of the renowned educators of Bangladesh.

I consider it an honour to have worked with Habib from his first day as a non-formal education development worker and to have seen him grow and excel professionally. It was a privilege to have Habib as one of my closest friends. I miss him now but am thankful for his legacy.

James Jennings
Educational Consultant

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান একটি প্রতিষ্ঠান

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান। শুধু একটি নাম নয়, এ নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক অনেক বয়স্ক, কিশোর ও শিশুর শিক্ষার্জন। তিনি বয়স্ক শিক্ষা দিয়ে তার এনজিও কর্মজীবনের যাত্রা শুরু করলেও ধীরে ধীরে তিনি কৈশোর শিক্ষা ও শিশুশিক্ষায় তার পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন।

বছর দু'য়েক আগে আ. ন. স. হাবীবের সঙ্গে ফোনে আলাপচারিতার ফাঁকে বলেছিলেন, আপনার জীবন বৃত্তান্ত আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আর আমারটা আপনাকে পাঠিয়ে দেব। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, কে কখন চলে যাব তার তো ঠিক নাই। তখন আমরা একে অন্যের জন্য যেন লিখতে পারি। সবাইকে জানাতে পারবো আমাদের অবদানের কথা। আমি হেসে বলেছিলাম, আপনার জীবন সম্বন্ধে লেখার জন্য আমার কোন জীবন বৃত্তান্তের প্রয়োজন হবে না। এরপর হাবীব সাহেব তার জীবন বৃত্তান্ত আমাকে পাঠাননি, আমিও পাঠাইনি।

আজ তিনি নেই। তিনি রিলে রেসে প্রথম হলেন আমাদের মধ্যে। তিনি যে শীঘ্রই চলে যাবেন তা কী বুঝতে পেরেছিলেন? কে জানে তাঁর মনের গভীরে সহসা চলে যাবার বিষয়টি অনুরণিত হচ্ছিল কি না? তিনি ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে উন্নয়ন জগতে অবদান রেখেছেন। নানা পদে, নানান বিষয়ে, নানান প্রতিষ্ঠানে। কখনো প্রশিক্ষক, কখনো বা তিনি উপকরণ উন্নয়নবিদ, কখনো তিনি মূল্যায়ক বা গবেষক কিংবা ব্যবস্থাপক, পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর কর্মজীবনের বড় পরিচয় হলো তিনি একজন সফল উপকরণ উন্নয়নবিদ ও প্রশিক্ষক। আর সে কারণেই তাঁর প্রচুর অনুসারী ও অনুরাগী রয়েছে। এরাই তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর সে কারণেই আ. ন. স. হাবীব নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন।

আ. ন. স. হাবীব চির জাগরুক রবে আমাদের মনে, কাজে ও ভাবনায়।

ম. হাবিবুর রহমান
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান: সাক্ষরতার অদম্য এক ফেরিওয়ালা

কোন একক বিশ্লেষণে অভিহিত করা তাঁকে মানায় না। তিনি ছিলেন অমরত্বের ধ্যানে নিমগ্ন এক পুরুষ। কী করেননি, প্রায় ৭০ বছরের কর্মময় জীবনে রাজনীতি, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, জনসেবা, সংগঠন নির্মাণ, উপকরণ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ পরিচালনা, পরামর্শকের কাজ, আরো কতো কী?

আ. ন. স. হাবীব ছিলেন আবেগাপ্লুত স্বপ্নচারী। একই সাথে প্রতিবাদী, নিরলস, নিষ্ঠাবান, উদ্যমী, মৌলিক চিন্তার অধিকারী, সফল সংগঠক ও মানবহিতৈষী। ৮০-৯০ এর দশকে সাক্ষরতার ধারণাকে বাস্তবায়ন ও উর্দ্ধে ধরতে কাজ করেছেন তৃণমূলে দেহাতি মানুষের সাথে, তেমনি কাজ করেছেন নীতি নির্ধারক পর্যায়ে। ছুটে বেড়িয়েছেন–কখনো সিলেটের প্রত্যন্ত গ্রামে, কখনো মেহেরপুরের বল্লভগ্রামে কিংবা চাঁদপুরের হাইমচরে, আবার কখনো রাজধানী ঢাকায়। এমন কি দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে।

সিলেটের এফআইভিডিবি থেকে তার সাক্ষরতার মিশন শুরু। এফআইভিডিবি তখন চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলো অনেকটা অন্তর্মুখী। বলতে গেলে আ. ন. স. হাবীব একে বহির্মুখী করে তুলেন। ১৯৮৪-তে সিলেটে আয়োজন করেন- জাতীয় লেখক কর্মশিবির। যাতে দেশের সকল প্রান্তের সাক্ষরতা কুশলীরা অংশ নেন। ১৯৮৫-তে সিলেট শহরে আয়োজন করেন সাক্ষরতা দিবসের কর্মসূচি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি শহরের সকল স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সাংবাদিকরা অংশ নেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান।

একজন পথিকৃৎ চলে গেলেন সব কর্মচাঞ্চল্যকে স্থবির করে দিয়ে। এক শূন্য নীরবতাকে ছড়িয়ে দিয়ে। সশ্রদ্ধ সালাম, আ. ন. স. হাবীবুর রহমান।

মোহাম্মদ মহসীন
সাক্ষরতা কুশলী

অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু স্মৃতি

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে চার দশক একাধারে কাজ করে যাওয়া এক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, যিনি নিয়মিত লিখে গেছেন এবং নিরন্তর বলিষ্ঠভাবে বলে গেছেন। শিক্ষা বিষয়ক তাঁর অনেক লেখালেখির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে, *'ফিরে দেখা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ৩ যুগ'* গ্রন্থ রচনা। ২০১৩ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে 'শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন গবেষণার তথ্যসহ করণীয় বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে।

মনে পড়ে, আর একজন নিবেদিতপ্রাণ সাক্ষরতা কর্মীর কথা, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। সন্দ্বীপ ভাইয়ের সাথে আ. ন. স. হাবীব ভাইয়ের যে মিলটি আমি খুঁজে পাই তা হচ্ছে দুজনেই বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনে স্পষ্টভাষী প্রবক্তা এবং প্রাকটিশনার বিশেষজ্ঞ। বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সেমিনার বা নীতি নির্ধারণী সভায় তাঁরা দুজনেই জোরালো ভাবে যুক্তি ও দাবী উত্থাপন করতেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সম্ভবত সর্বশেষ যে অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ৩ মে ২০১৭ তারিখে। বাংলা একাডেমীতে আয়োজিত একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে। লোকজ উপাদানভিত্তিক ১৪টি উপকরণ প্রকাশের এ অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁর ভাল লাগার কথা তিনি সেদিনেই সবিস্তারে সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন।

মিশনে সহকর্মী হিসাবে তাঁকে দেখেছি এক ঝাঁক উপকরণ উন্নয়ন কর্মীকে নিরলসভাবে নেতৃত্ব দিতে। বৈচিত্র্যময় সংখ্যাগত চাহিদার সাথে গুণগত চাহিদার সমন্বয় ঘটাতে উপকরণ উন্নয়ন বিভাগের প্রধান হিসাবে তাঁকে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছিল। একান্ত আলাপচারিতায় প্রফুল্লচিত্তে এসব অভিজ্ঞতার কথা তিনি অনেকবার বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা সংগঠক হিসাবে তাঁকে দেখেছি 'উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাষ্ট'-এর প্রতিষ্ঠা এবং এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ঢাকার মিরপুরে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করতে।

ড. এম. এহছানুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

একজন শিক্ষা-অন্তঃপ্রাণ মানুষ

২৫ বছরের বেশি সময় ধরে পেশাদারী কাজে একসাথে পথ চলেছি। তার বাইরেও তাঁকে পেয়েছি, মাঝে মাঝে। তাঁর পেশাদারী কর্মসততা ও ব্যক্তিগত জীবন ছিল সহজ কিন্তু ঋজু। সাক্ষরতা বা উন্নয়ন ধারায় কোনো আলোচনা বা কাজে সহজে হাল ছেড়ে দিতেন না, আপোস করতেন না, ছাড় দিতেন না।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা চর্চা বিকাশে ও বিস্তারে আ. ন. স. হাবীব ভাইয়ের কর্মদক্ষতা ও শিক্ষাভাবনা ছিল বাস্তবানুগ। শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ করে বয়স্ক সাক্ষরতা ও শিশুশিক্ষার উন্নয়নে তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন।

পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষাদর্শনে ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং কর্মনিষ্ঠা। তিনি নানা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমে ফ্রেইরির মুক্তিকামী শিক্ষাদর্শনের রূপায়ণে পদ্ধতিগতভাবে অবদান রেখেছেন। আমার ধারণা, তিনি বয়স্ক ও শিশু শিক্ষাখাতে যে মূল্য সংযোজন করেছেন, তা কাঙ্ক্ষিত জনসমাজে কিছুটা হলেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আ. ন. স. হাবীব আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক উপকরণ তৈরিতে সূচনাকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি ছিলেন সমাজ, রাজনীতি ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। ছিলেন একজন ঠাণ্ডা মেজাজের সহজ মানুষ। তাঁর জীবনাচরণ, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, মুক্তচেতনা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। পেশাগত কাজের মধ্যে তাঁর একাগ্রতা যেমন ছিল, তেমনি তাঁর ছিল কপটতামুক্ত এক ঋদ্ধ জীবন।

সিরাজুদ দাহার খান
নির্বাহী প্রধান, ইন্টার‍্যাকশন

আ. ন. স. হাবীব ভাই : আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

এই তো, ক'দিন আগেও আমাদের প্রিয় হাবীব ভাই আমাকে ফোন করলেন আমেরিকার হাসপাতাল থেকে। নাম ধরে ধরে তিনি অনেকের কুশল সংবাদ নিলেন। খোঁজখবর নিলেন আমাদের কাজ-কর্ম কেমন চলছে, প্রি-ভোক শিক্ষা উপকরণ প্রকাশিত হলো কিনা ইত্যাদি। মনে হলো সকলের কুশলের জন্য তাঁর অনেক উদ্বেগ!

এ দেশের শত শত সাক্ষরতা ও শিক্ষাকর্মীর জন্য তাঁর এ উদ্বেগ আমি দেখেছি বিগত পঁচিশ বছর ধরে। কার চাকরি নেই, শরীর খারাপ, বসের সাথে মনোমালিন্য- এসব নিয়েই তাঁর উদ্বেগ।

এদেশের নিরক্ষরতা দূর করে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা যুগ যুগ ধরে উন্নয়ন কর্মীদের পাথেয় হয়ে থাকবে। তাঁর রচিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বইপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, উন্নয়ন প্রবন্ধসহ অন্যান্য বইপত্র সমৃদ্ধ করবে এদেশের উন্নয়ন কর্মীদের। তাঁর আদর্শ, দেশপ্রেম সত্য-ন্যায়, অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি অনুরাগ অনুপ্রাণিত করবে তাঁর উত্তসূরীদের যুগ যুগ ধরে।

তাঁর মৃত্যুতে কিছুটা হলেও থমকে গেলো সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন অভিযাত্রা। অনেক ঋণ তাঁর কাছে আমার, আমাদের। এ দেশের অগণিত সাক্ষরতা কর্মীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধাঞ্জলি!

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

আলোকিত একজন মানুষ, আমাদের প্রিয় হাবীব ভাই

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান, আমাদের প্রিয় হাবীব ভাইকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক কিছু কথা লিখার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। মনে হচ্ছে আমাকে যেন জীবনের কোনো এক কঠিন অঙ্কের সমাধান করতে দেওয়া হয়েছে। যার শুরু এবং শেষ কোনোটাই আমার জানা নেই।

আসলে হাবীব ভাইকে নিয়ে আমাদের কোনো স্মৃতি নেই তো। তাঁকে নিয়ে যা আছে তা হলো জীবন্ত কথকতা। সবকিছু প্রাণময় সজীব। যে কঠিন সত্যের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি তাকে কথার আভরণ দিয়ে ঢেকে, মনকে প্রবোধ দেবার মতো শব্দাবলী আমার জানার মধ্যে নেই। যেদিন হাবীব ভাই ফ্লাট বাসার নিচ তলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্সে চিরনিদ্রায় শায়িত, সেদিন অন্যদের কথা শুনছিলাম। এক সময় খুব ঠাণ্ডা অথচ মিষ্টি কণ্ঠে বলেছিলেন হাবীব ভাইয়ের এক ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, আমাদের শাহীন ভাবী, 'ভাইসাব নিজে একজন আলোকিত মানুষ, তার সংস্পর্শে এসে অন্যরাও আলোকিত হয়ে যায়।' আমি আমার থেকে একটু দূরে বসা বক্তার মুখের দিকে চাইলাম। আমি অভিভূত হয়েছিলাম তার কথায়। কীভাবে কত সহজে অলঙ্কারহীন স্বাভাবিক ছন্দে শাহীন ভাবী হাবীব ভাই সম্পর্কে একটি ধ্রুব সত্য তথ্য তুলে ধরলেন। হাবীব ভাই একজন আলোকিত মানুষই বটে। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মহানুভবতা, অন্যের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, ধনী-দরিদ্র, জজ- ব্যারিস্টার, মজুর-মুটে সব ধরনের মানুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষার যে আলো, তার উষ্ণতায় আমরা বার বার স্নাত হয়েছি। কিন্তু পরিশুদ্ধ হতে পেরেছি কতটুকু?

হাবীব ভাই ও তাঁর পরিবারের সাথে আমার পরিচয় প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে। প্রশিকায় কাজ করার সময় তিনি সরাসরি আমার সুপারভাইজার ছিলেন। হাবীব ভাইয়ের তিন সন্তানই উদাহরণযোগ্য সুসন্তান হয়েছে। আর ভাবী ! তিনি তো শ্বেত পাথরে ঘষা সুবাসিত চন্দন। সময়ে অসময়ে যখন তখন বাসায় গিয়ে অফিসের কাজ করি, খিদে পেলে কোনোরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া খাবার টেবিলে বসে যাই। এমনি এক অদৃশ্য অথচ আত্মিক সম্পর্কের বাঁধনে বাধা পড়ে গেছি। এ বাঁধন একেবারে অচ্ছেদ্য।

আইনুন নাহার বেগম
স্বাধীন পরামর্শক, শিক্ষা ও জেন্ডার

আমাদের প্রিয় হাবীব ভাই

৪ জুলাই ২০১৮, ঢাকায় আসব বলে কক্সবাজার এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছি। অলস সময় তাই ফেইসবুকে প্রবেশ আর কঠিন বার্তাটি পড়া- "Habib Bhai is No More"। মেনে নিতে পারছিলাম না, এমনকি বিশ্বাসও হচ্ছিল না। প্রায় ২০ বছরের বেশি সময় হাবীব ভাইকে চিনি এবং অনেক কাজ করেছি ওনার সাথে। হাবীব ভাই আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, যাঁর কাছ থেকে আমি শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার উৎসাহ পেয়েছি। তিনি এতটাই ভালো মানুষ যে কখনও কোনো বিষয়ে বিরক্ত হতে দেখিনি, বরং হাসি মুখে সকল বিষয়কে মেনে নিতে ও নেতৃত্ব দিতে দেখেছি। কোনো বিষয়ে সমস্যা, পরামর্শ দরকার হলে সাথে সাথে ফোন করেছি এবং বড় ভাই এমন ভেবে সাহায্য করেছেন। হাবীব ভাই পরলোকে পাড়ি জমালেও আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন সবসময়, আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

শিরীন আক্তার
প্রোগ্রাম অফিসার (শিক্ষা), ইউনেস্কো

জয়তু হাবীব

তাঁর অকালপ্রয়াণ আমাদেরকে গভীর বেদনা ও হতাশার আবর্তে ফেলে দিয়েছে। তবে আমরা যদি তাঁর অর্জনগুলো বিবেচনায় নিই – সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শিক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টাগুলো যদি স্মরণ করি– তবে আমাদের ভাবনাগুলো অনেক স্বস্তিদায়ক হয়। বিশেষভাবে বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর মেধা আর দক্ষতার প্রয়োগ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই আজ আমার ভাবনাগুলো শোকাতুর নয়, বরং "উদযাপনমূলক" হতে চাইছে।

মুহাম্মদ তাহের
উন্নয়ন সহকর্মী

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান: স্মৃতিতর্পণ

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর সে কেথা কোথা কবে।' বুদ্ধদেবের কাছে সন্তানহারা সুজাতা পুত্রকে বাচিয়ে তুলবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব শোকার্ত মা'কে বলেছিলেন সমগ্র নগর ঘুরে নিয়ে এসো এমন কোন গৃহের সন্ধান, যেখানে মৃত্যুও অভিগম্যতা নেই। মৃত্যু এমনই কঠিন, নিষ্ঠুর ও অনিবার্য। আর কোন আপনজনের চলে যাওয়া যদি ঘটে অকালে, তার বেদনা সুগভীর।

চলে যাবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই আ. ন. স. হাবীবুর রহমানের ব্যয়বহুল চিকিৎসা চলছিল। তবুও সেসময় তার হাসিমুখ, বন্ধুবৎসল সম্ভাষণ, জীবনকে উদযাপনের জন্য আকণ্ঠ ইচ্ছা প্রভৃতির যে ছাপ দেখেছি, তাতে একেবারেই মনে হয়নি এত দ্রুত তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

আমার সঙ্গে আ. ন. স. হাবীবুর রহমানের নিবিড় সখ্য ছিল, তা দাবি করতে পারি না, কিন্তু আমাদের সম্পর্কের গভীরতা ছিল। সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে যে ব্যক্তি আজীবন 'উদ্ভাবনীমূলক ও সুচিন্তাপ্রসূত' কাজ করছেন, তার কাজ অবলোকন করেছি, অসংখ্য আলোচনা-সভায় তার ব্যক্ত অভিমত শুনেছি। তা থেকে এই মানুষটার চিন্তারেখার যে ভূগোলটা বুঝতে পেরেছি, তা শুধু ওই পেশাগত ভাবনা ও কার্যপরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বুঝেছি, তার ওই মনোভূগোলটার মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ আছে, তার বঞ্চনা ও দারিদ্র্য নিয়ে। সমাজসংলগ্ন অনেক কথা হাবীব ভাই কখনো-সখনো মুঠোফোনের বার্তার মাধ্যমে পাঠাতেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে বলতে চাই, লেখা দিতে তিনি কার্পণ্য করতেন না, সময়ের বিষয়ে কথা রাখতেন।

বছর তিনেক আমি শ্যামলীতে তার প্রতিবেশী ছিলাম। ঘন ঘন দেখা হত, তা বলতে পারব না। তবে সদাই অনুভব করতাম অন্তরের উষ্ণতা নিয়ে, প্রয়োজনে নিঃস্বার্থ হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য একজন মানুষ আছেন ত্রিশ মিটারের মধ্যে। তা যেন আমাকে আশ্বস্ত করতো। এমন পরম আশ্বাস প্রদায়ী একজন সুজনের বিয়োগব্যথা আমাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে আছে।

অধ্যাপক শফি আহমেদ
উপদেষ্টা সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন

মৃত্যুঞ্জয়ী আ. ন. স. হাবীবুর রহমান

হাবীব ভাইয়ের অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তাঁকে সম্মাননা জানানোর বিষয়টি বেশ জোরে-সোরে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এক সময় সাহস নিয়ে ভাইকে বলে ফেললাম সম্মাননা দেবার বিষয়টি। এর আগে বার কয়েক বলেছিলাম, কখনই সায় দেননি। তবে এবার বলায় নীরব ছিলেন। *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তিন যুগ* বইটি'র প্রকাশক নিশাত জাহান রানা আপা'র সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। নিশাত আপাকে আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যের একটা কমিটি হয়- "বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ"। ভাইকে সম্মাননা দেয়ার বিষয়টি অবহিত করলাম এবং সম্মাননা কমিটির সদস্যদের পরিচয় তাঁকে অবহিত করলাম। সবাই তাঁর ঘনিষ্ঠ, সহকর্মী ও প্রিয়জন।

অবশেষে সম্মাননার তারিখ ৩১ মার্চ নির্ধারিত হলো। প্রস্তুতিমূলক সভা ও ভাইয়ের বন্ধু, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে যোগাযোগ করা হল। একটা সুভেন্যির প্রকাশ করা হবে। লেখা আহবান করা হল বন্ধু প্রিয়জনদের কাছ থেকে। শুভাকাঙ্ক্ষী, সহকর্মী ও বন্ধুরা এগিয়ে এলেন। ভাই নিজেও অসুস্থতার মাঝে এগিয়ে এলেন। পারিবারিক ছবির বেশ কয়েকটা অ্যালবাম থেকে ছবি খুঁজে এবং প্রতিটি ছবির স্থান ও দিনক্ষণ স্পষ্টভাবে বলে দিলেন। বিশ-পঁচিশ বছরের পূর্বে তোলা ছবিও এক বাক্যে বলে দিলেন কবে, কোথায় এবং কখন এ ছবি তুলেছেন। তিনি নিজ হাতে ছবির ক্যাপশন লিখে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানটি শুরু হতে দেরি হলেও চমৎকারভাবে শেষ হল সম্মাননা অনুষ্ঠানটি। তাঁর জীবদ্দশায় গণসাক্ষরতা অভিযান এবং বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণের দেয়া সম্মাননা ছিল তাঁর একান্ত অর্জন।

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু সহস্র মানুষের উপস্থিতি, সুধী-গুণীজনদের তাঁর প্রতি ভালবাসা ও বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি আমাদের মাঝে আছেন। শ্যামলীস্থ মসজিদের নামাজের জানাজায় শত-শত সুধী ও গুণীজনের উপস্থিতি, ব্র্যাক-এর স্যার ফজলে হাসান আবেদ, আহ্ছানিয়া মিশনের জনাব কাজী রফিকুল আলমসহ উচ্চ পদস্থ এনজিও ব্যক্তিত্ব এসেছিলেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। তিনি শত-সহস্র কর্মী ও সাধারণ মানুষ আর গুণীজনের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী।

যাকোব বাড়ৈ
নির্বাহী পরিচালক, উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট (ইউএসপিটি)

উদ্যোগী হাবীবুর রহমান

নব্বই দশকের গোড়ার দিক। দীর্ঘ স্বৈরতন্ত্রের পর কেবল গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। সকলেরই দেশের জন্য অনেক কিছু করার আগ্রহ। সেই সময় গণসাক্ষরতা অভিযানেরও যাত্রা শুরু। অভিযানের সঙ্গে এক এক করে নানা কাজে যুক্ত হচ্ছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাক্ষরতা কর্মীবৃন্দ। এরকমই একটা সময়ে আমরা জনাকয়েক মানুষ নির্ধারিত কাজের বাইরে আরো কিছু করার আগ্রহে কয়েকটি সভায় মিলিত হলাম। যতদূর মনে পড়ে সেসব সভায় ছিলেন- আ. ন. স. হাবীবুর রহমান, ম. হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ মহসীন, এহ্ছানুর রহমান, শাহনেওয়াজ খান, এলয়সিয়াস মিলন খান, আরো কেউ কেউ! সিদ্ধান্ত হলো নব্যসাক্ষরদের জন্য একটা পত্রিকা বের করা হবে। তখন এরকম পত্রিকা খুব দুর্লভ ছিল। প্রস্তাবটি প্রধানত আ. ন. স. হাবীব ভাইয়েরই। পরিচয়ের পর থেকেই দেখেছি অনেক কিছু করতে চাইতেন হাবীব ভাই। ঢাকঢোল পিটিয়ে নয়। নিতান্তই স্বভাববশে। আরো সিদ্ধান্ত হলো যে, এক একটি সংখ্যার সম্পাদনা যৌথভাবে দু'জন করবেন। সবাই মিলে প্রথম সংখ্যাটির দায়িত্ব আমার এবং এলয়সিয়াস মিলন খানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। পত্রিকার নাম স্থির হল 'কথা'। প্রথম সংখ্যা বের হলো। তারপর ধীরে ধীরে আরো অনেক উদ্যোগের মতো এটাও একসময় থেমে গেল। কেন যে কে জানে! জগতের নিয়মে! পত্রিকা ছাড়া সবাই সাক্ষরতার আরো অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল বোধহয়! আমিও তখন আর একটি পত্রিকা *'সাক্ষরতা বুলেটিন'* বের করার ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। এরকম কিছু না কিছু করার অভিপ্রায় বোধ হয় হাবীব ভাইকে কখনোই ছাড়ত না!

মানুষের- বিশেষত বঞ্চিত-দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করার আগ্রহ ও উদ্যম ছিল হাবীব ভাইয়ের চেতনায়-মননে।

নিশাত জাহান রানা
প্রধান নির্বাহী, যুক্ত

হাবীব ভাই : শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আ. ন. স হাবীবুর রহমানের সাথে আমার পরিচয় তিন দশকের বেশি সময়ের। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা এক সাথে অনেক কাজ করেছি।

বয়স্ক সাক্ষরতা উপকরণ *চেতনা* উন্নয়নের সময় থেকেই হাবীব ভাইয়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে এ ঘনিষ্ঠতা পারিবারিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। একসময় হাবীব ভাই ও আমি একই এপার্টমেন্টে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি। কাছাকাছি থাকার সুবাদে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। সদা হাস্যোজ্জ্বল, সাদামাঠা, সহজ সরল ও সৎ ছিলেন হাবীব ভাই। তাঁর ধারণাগুলো দৃঢ়ভাবে বলতে ও ছড়িয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না তিনি।

১৯৯২ সালে আমার আহ্ছানিয়া মিশনে যোগদানের কিছুদিন পরই হাবীব ভাই মিশনে যোগ দেন। তখন আমরা একসাথে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিষয়ে বিশাল কর্মকান্ড শুরু করি। হাবীব ভাই-এর সাথে কাজ করতে পারা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। হাবীব ভাই বাংলাদেশের সাক্ষরতা ইতিহাসের আদ্যোপান্ত জানতেন। তাঁর কাছে থেকে নানা বিষয়ে জেনেছি ও পরামর্শ পেয়েছি।

উপানুষ্ঠানিক সাক্ষরতা উপকরণ উন্নয়ন- এই ক্ষেত্রে সবার আগে যে নামটি উচ্চারিত হয় তিনি হলেন আ. ন. স হাবীবুর রহমান। বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের নানামুখী চাহিদা বিবেচনায় তিনি তৈরি করেছেন অসংখ্য উপকরণ। এ ছাড়াও তাঁর রচিত সম্পাদিত অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ বাংলাদেশের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। আ. ন. স হাবীবুর রহমান তার কাজের জন্য আর একজন ভালো মানুষের প্রতিচ্ছবি হিসাবে বেঁচে থাকবেন আমাদের সবার হৃদয়ে।

শাহনেওয়াজ খান
সি ই ও, সিনেড, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

স্মরণ: আ. ন. স. হাবীবুর রহমান

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণ প্রণেতা হিসেবে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন আ. ন. স. হাবীবুর রহমান। জাতীয়ভাবে প্রণীত *চেতনা* প্রাইমারসহ অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণের তিনি ছিলেন একজন অন্যতম লেখক, সম্পাদনাকারী ও সংকলনকারী। শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ছাড়াও তিনি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো আয়োজিত নানা সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতেন। সব সময় তিনি উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের জন্য দাবী উত্থাপন করতেন। মানসম্মত শিক্ষার কথা বলেছেন। পিছিয়েপড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকারের কথা বলেছেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তাঁর সৃষ্টি থেকে অনেক কিছুই শেখার রয়েছে।

তাঁর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা ও সম্মান। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁর অবদানের কথা।

মোহাম্মদ রুকুনউদ্দিন সরকার
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা), বিএনএফই

আ. ন. স. হাবীব আমাদের প্রেরণার উৎস

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান বিগত চার দশক ধরে বয়স্ক সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমাদের কাছে সুপরিচিত।

কিন্তু এর বাইরেও আড়ালে-আবডালে তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। শিক্ষা ও সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট (ইউএসপিটি)-এর ব্যানারে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য শিশুশিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং পিছিয়ে থাকা নারীদের জন্য ব্যবহারিক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এ সংস্থার নারী শিক্ষার্থীদের একটি সমাপনী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ওদের দৃষ্টিতে শেখার প্রতি অদম্য আগ্রহ, উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখেছি। এ সংস্থার চেয়ারপারসন ছিলেন আ. ন. স. হাবীব। আ. ন. স. হাবীবুর রহমান ছিলেন প্রচারবিমুখ নিভৃতচারী শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মী। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেকের শিক্ষার খরচ যুগিয়েছেন, অনেক পরিবারের টিকে থাকার সংগ্রামে সহযোগিতা করেছেন। অনেকের জীবনতরী সচল রাখতে, অনেকের কর্মসংস্থানে-চিকিৎসায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এভাবে তিনি অনেকের মনের মণিকোঠায় প্রিয় হয়ে আছেন।

আ. ন. স. হাবীবের একটি বড় গুণ ছিল অসীম ধৈর্য, কোনো কাজের পিছনে ধৈর্য ধরে লেগে থাকার ক্ষমতা। অভিযানের উদ্যোগে গঠিত সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরামের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য; সব মিটিংয়ে তিনি সাগ্রহে উপস্থিত থাকতেন এবং ফোরামের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও তিনি সবসময় অভিযানের সহকর্মীদের উৎসাহ যোগাতেন। কখনো কখনো কর্মীদের উৎসাহে ভাটা পড়লে হতাশাও ব্যক্ত করতেন। সাদাকে 'সাদা' আর কালোকে 'কালো' বলার দুর্দান্ত সাহস ছিল তাঁর।

দীর্ঘদিনের সহকর্মী আ. ন. স. হাবীবুর রহমান আমাদের প্রেরণার উৎস। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রদান করুন, এ আমাদের প্রার্থনা।

রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

যেহীন আহমদ

আমাদের হাবীব

"Everybody has a creative potential and from the moment you can express this creative potential, you can start changing the world." -Paulo Coelho

সিদ্ধান্ত নিই যে, এফআইভিডিবি (Friends in Village Development in Bangladesh: FIVDB)-র কর্ম-এলাকায় ব্যবহার্য একগুচ্ছ সাক্ষরতা-উপকরণ, ব্যবহারিক সাক্ষরতা কার্যক্রমে প্রয়োগের উপযোগী উপকরণ উন্নয়ন করব। তখন আমাদের সঙ্গে জেমস জেনিংস নামে এক আমেরিকান সহকর্মী যোগ দেন। জেমসের অধ্যয়ন ছিল শিক্ষা ও শিক্ষণের উপর। তদুপরি তিনি 'ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট' থেকে একবছর মেয়াদে বাংলা ভাষাগত দক্ষতা রপ্ত করেন। ১৯৮১-র মধ্যভাগে এই সাক্ষরতা উপকরণ উন্নয়নের কাজ করার জন্য আমরা একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিই। নিয়োগপূর্ব সাক্ষাৎকারে অন্যান্য অভিজ্ঞ প্রার্থীদের তুলনায় হাবীবকে আমাদের ভালো লাগে। এর একটা কারণ, তাঁর চিন্তা-ভাবনায় উন্নয়ন ও শিক্ষার বিষয়টিকে তিনি মুক্ত ও পরিক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে দেখতে আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়েছিল। তাঁর ছিল বামপন্থী প্রাগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তা ও চর্চার সঙ্গে সংযোগ ও সংশ্লিষ্টতা।

ব্যবহারিক সাক্ষরতায় আমাদের কাজ শুরু হয় তৃণমূলে বহুল ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার তৈরির মাধ্যমে। একটি কর্মসহায়ক সমীক্ষা পরিচালনার মধ্য দিয়ে এই শব্দভাণ্ডার নির্মাণের অভিযান শুরু হয়। এই কাজে জেমস জেনিংসকে সহায়তা করেন হাবীব, দীপ্তি, এনায়েত ও আরো অনেক তরুণ উন্নয়ন-সহকর্মী। তারপরেই শুরু হয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ তৈরির কাজ। প্রত্যেকদিন সকালবেলা একটি পাঠ তৈরি হতো এবং ঐদিনই বিকেলে ও সন্ধ্যায় দুইটি পরীক্ষণ-পর্যায়িক শিক্ষাচক্রের বৈঠকে সেই পাঠের মাঠপরীক্ষা হতো। বৈঠকদ্বয়ের মধ্যে একটি নারীদের এবং অন্যটি পুরুষদের সমবায়ে পরিচালিত হতো। প্রতিদিনের মাঠপরীক্ষণের আলোকে প্রতিদিনই পাঠ পরিমার্জন করা হতো।

এ-পর্যায়ে দরকার হতো উপকরণের ছাপা ও অঙ্গসজ্জা। আমাদের উপকরণ তৈরিতে হস্তলিপি করে দিতেন আহমদ আলী এবং প্রয়োজনীয় অলংকরণ করতেন নিপু বুদ্ধ। আমাদের যোগাযোগ বিভাগের ছিল চমৎকার একটি টেবিল-টপ প্রিন্টার, যা প্রত্যেকদিন এনায়েত এবং পাঞ্চালী দত্ত প্রমুখ পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন এবং তারা পাঠোপকরণের ছাপাকর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেন। এভাবে দিনের পর দিন নিরলস কাজ করে কয়েক মাসের মধ্যে গোড়ার চল্লিশটি পাঠ উন্নয়ন করা হয়। পরে এই অভিজ্ঞতার আলোকে মাঠপরীক্ষণের মাধ্যমে আরও কুড়িটি পাঠ তৈরি হয়।

এই ব্যবহারিক সাক্ষরতা উপকরণমালা আমরা মূলত সিলেট অঞ্চলের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করেছিলাম। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের আরও উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠান এই উপকরণ ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে আমাদেরকে নিজস্ব এলাকায় শিক্ষাচক্র পরিচালনার পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকেও প্রশিক্ষণ-সহায়তা ও উপকরণ সরবরাহ করা আরেকটি বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখ্য, গত শতকের আশি-নব্বই ও একবিংশ শতকের প্রথম দশকের কালপরিসরে তিন শতাধিক প্রতিষ্ঠান এই সাক্ষরতা উপকরণ ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে তিরিশ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এই উপকরণমালার সুবাদে প্রাথমিক পঠন, লিখন ও গণন দক্ষতা লাভ করেন।

এই পুরো কর্মযজ্ঞে জেমসের পাশাপাশি হাবীব ছিলেন গভীরভাবে সম্পৃক্ত। উন্নয়নদর্শন ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন ও অবয়ব সম্পর্কে জানতে নিত্য অনুসিন্ধৎসু ছিলেন হাবীব। অনুসন্ধিৎসু মন ও মননের এই বৈশিষ্ট্যই হাবীবকে পেশাগত জীবনের বিশাল ময়দানে এনে দিয়েছিল ক্রমোৎকর্ষ ও সফলতা। আরেকটি বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল অনন্য। অতি সহজ ভাষায় সাক্ষরতা উপকরণ এবং নব্য-সাক্ষরদের উপযোগী সহজপাঠ্য উপকরণ উন্নয়নে জনগোষ্ঠীর নিত্যব্যবহার্য বুলির কাছাকাছি শব্দচয়ন ও গল্পনির্মাণ। সংযোগের ভাষা ব্যবহারে হাবীব ছিলেন সবসময় সচেষ্ট।

এফআইভিডিবি-তে তিনি একদশকেরও বেশি সময় ধরে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন ও সঞ্চালনের কাজ করেছেন। এরপরে তিনি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে কাজ করেছেন, লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের সাক্ষরতা কার্যক্রম রূপায়ণে হাবীব প্রভূত অবদান রেখেছেন। সর্বত্রই আমরা হাবীবের সৃজনশীল কর্মোদ্দীপনার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি।

বেদনাদায়ক হলেও অমোঘ প্রাকৃতিক ব্যাপার হচ্ছে যে, জীবনের শেষ কয়েকটি বছর হাবীব লড়াই করেছেন রোগব্যাধির সঙ্গে। এবং যে বয়সে তিনি বিদায় নিয়েছেন ইহলোক থেকে, এই সময়টা আদৌ প্রস্থানের বয়স নয় নিশ্চয় আজকের যুগে। এরপরও লড়াকু হাবীব, সদা কর্মচঞ্চল ও কর্তব্যনিষ্ঠ হাবীব, জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন উন্নয়ন-উপদেশনা ও সৃজনপ্রয়াসী কর্মপ্রকল্পনা নির্মাণের সঙ্গে। এই দেশের অনগ্রসর ও অনুন্নয়নপীড়িত জনগোষ্ঠী ও জনপদের জন্য সুস্থায়ী শিখনসুযোগ তৈরিতে, উৎকর্ষগামী জীবনযাত্রার ব্যবস্থা রূপায়ণে, রেখে গেছেন তিনি তাঁর জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার সারনির্যাস।

যেহীন আহমদ
নির্বাহী পরিচালক, এফআইভিডিবি

শ ফি উল আ ল ম

আ. ন. স. হাবীবুর রহমানঃ শিক্ষাবিস্তারের আজীবন পদাতিক

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান চলে গেলেন। জীবনের সত্তরের দশকে পা দেওয়ার দু'বছর আগেই চলে গেলেন এই জীবনভর শিক্ষাকর্মী।

বৃহত্তর সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচং গ্রাম থেকে উঠে এসেছিলেন তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন একজন নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক। আ. ন. স. হাবীবুর রহমানের জীবন শুরু হয়েছিল শিক্ষকতা দিয়ে। তারপর সেই তরুণ জড়িয়ে পড়লেন বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে। তারপর তো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গন্ডির বাইরে কতো রকম কৌশল ও পথ আছে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা, ব্যবহারিক সাক্ষরতা, বয়স্ক ও সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা, গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জীবন দক্ষতা ও দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতা, গণসাক্ষরতা, বিকল্প শিক্ষা অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষের বাইরের, প্রথাগত শিক্ষার বাইরে কতো রকম পথ ও পদ্ধতি আছে, সবকিছুর সঙ্গে তাঁর মন-প্রাণ অর্ন্তআত্মার সম্মিলন, এমন একাগ্রতা ও অঙ্গীকারবদ্ধতা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার পিছিয়ে পড়া মানুষ, অনগ্রসর সমাজ, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া, তাদের নিজের করে নেওয়ার যে বিপুল কর্মকান্ড, তাঁর যে তৃণমূল পর্যায়ে মাঠ-দক্ষতা তাঁকে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে এক দৃঢ় অবস্থানে এবং একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রশংসার স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি এমন একজন প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন যা ছিল ঈর্ষণীয়।

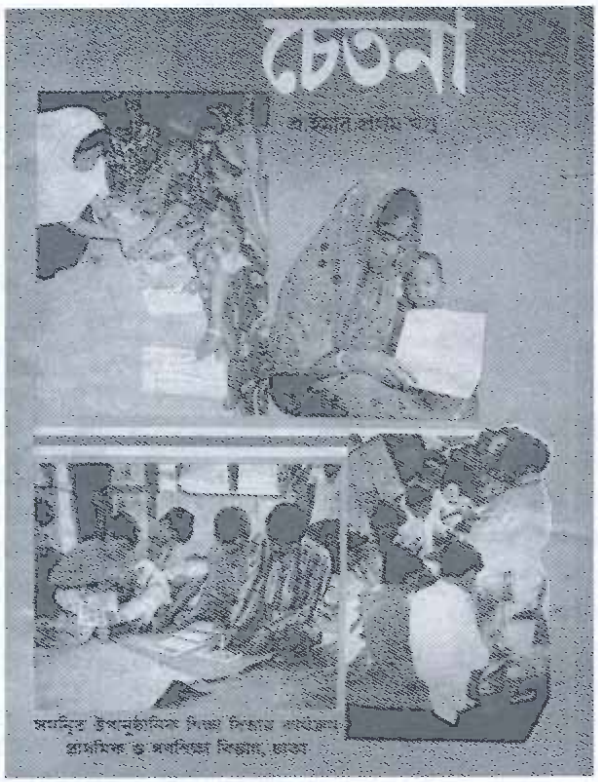

জীবনে চলার সূচনালয়ে এমন একজন মানুষকে তিনি বন্ধু, পথচালক ও সুহৃদ হিসেবে পেয়েছিলেন সেই মানুষটি তাঁকে অনুজের মতো কাছে টেনে নিয়ে উত্তরণের নানা পথে চালিত করেছেন। গাত্রবর্ণে আর্য, এই বিদেশি এই শিক্ষক-সাধক মানুষটি একজন খাঁটি বাঙালি, খাদ্যে-বচনে, চাল-চলনে, মননশীলতায়, রুচিবোধে একজন অসাধারণ বাঙালি– শিক্ষা ও উন্নয়কর্মীদের কাছে অতিপ্রিয় নাম জেমস জেনিংস। ১৯৭৬ সালে সিলেটে পরিচয় হয়েছিল এফআইভিডিবি'তে কাজ করার সময়। জেনিংস লিখেছেন– 'সেই সময় থেকে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং আরও বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।' সেই সময়ের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন- 'আমাদের সিলেট জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে হাবীব গত চার দশকের বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রমসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তবতা আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন'।

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান ছিলেন নিরহংকার, স্পষ্টভাষী এক মানুষ। তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে এফআইভিডিবি'তে এ কার্যক্রম উন্মেষকালে যে মাঠ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাতে আস্তে আস্তে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। তাকে নব্বইয়ের দশকের সূচনালগ্নে প্রথম দেখি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে। একটা ভাড়া বাড়িতে ছিল তখন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অফিস। বর্তমান অফিসের যে বিশাল ভবন তার সামনের ডান দিকে। তিনি বসতেন নীচ তলায়। একদিন সে ঘরে দেখলাম মিশনের মুদ্রিত নানা উপকরণ, পোস্টার ইত্যাদি। তিনি খুব আগ্রহ ভরে দেখাচ্ছিলেন সেগুলো। তখন

এনসিটিবি-তে আমার কাজের বয়স ছ'বছর চলছে। বৃটিশ কারিগরি সহায়তার আওতায় বৃটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত এনসিটিবি'র দক্ষ ও পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে আমাকে পাঠানো হয়েছিল স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় মরে হাউজ কলেজে। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে ওখান থেকে এডুকেশনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি (PGEMA) নিয়ে দেশে যখন ফিরে এলাম তখন দেখি এনসিডিসি এসটিবিবি'র সঙ্গে একীভূত হয়ে নবরূপে এনসিটিবি'তে পরিণত হয়েছে। সেখানে যোগদান করি ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে। তার তিন চার বছর পর থেকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হতে শুরু হয়। আ. ন. স. হাবীবের সঙ্গে সেই যে পরিচয়, তারপর সেটা আরো গাঢ়ভাবে সুসংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে।

আমার মনে হয়েছে, শিক্ষা বিষয়ক নানা ধরণের কর্মশালা, আলোচনা সভা বা কোন জটিল উপস্থাপনার পর পর সাধারণ উন্মুক্ত আলোচনা যখন শুরু হয় তখনই তিনি সবার আগে হাত তুলে তার কথাটি স্পষ্টভাবে বলতেন। কারণ বক্র দৃষ্টি বা তির্যক কোন কিছুকে উপেক্ষা করে বলার চেয়ে বরং তিনি অংশগ্রহণকে দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তিনি সবসময় এজন্য সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের কাছে একজন সাহসী, প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৯৩ সালে INFEP গঠিত হওয়ার পর গাজীপুরে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সাক্ষরতা উপকরণ উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ৫ দিনব্যাপী একটি কর্মশালা গাজীপুরে অবস্থিত ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালের ১২ ও ১৩ জুন কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-এ দুদিনব্যাপী আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আবশ্যকীয় শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের নীতিমালা প্রণয়ন সম্পর্কিত একটি সম্মেলনের আয়োজন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। সেখানে অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মীদের সঙ্গে আ. ন. স হাবীবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। একটি দলগত আলোচনায় তিনি ও আমি একই দলে ছিলাম। ইউএনডিপি ও ইউনিসেফের অর্থায়নে সেই সম্মেলনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেবারই প্রথম বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে কী কাজ করছে তার একটা অনুপুঙ্খ আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে ১৫টি সুপারিশ প্রণীত হয়। দু'দিনের এই কর্মযজ্ঞে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক এর পক্ষ থেকে ড. সুধীর চন্দ্র সরকার এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও উপস্থাপন করেছিলেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে ম. হাবিবুর রহমান ও বেস থেকে মুহাম্মদ আজিজুল হক যোগ দিয়েছিলেন এ সম্মেলনে। গণসাক্ষরতা অভিযানের সাক্ষরতা বুলেটিন সংখ্যা ৩৮-৩৯, নভেম্বর ১৯৯৬-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তিতে যে সংখ্যা প্রকাশিত হয় তাতে আ. ন. স. হাবীবুর রহমান একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন যার শিরোনাম ছিল 'পঁচিশ বছরের সাক্ষরতা'। এ প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি বলেন–

> সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং দেশের জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষী অপরাপর প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করলে এ দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা মোটেই কষ্টকর কাজ নয়। বর্তমানে সেই শুভক্ষণের সূচনা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। মনে রাখতে হবে, আমরা মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার কথা বলি, দেশের মানুষকে সাক্ষর করতে না পারলে তা টিকিয়ে রাখা যাবে না।

এ দেশের সাক্ষরতা আন্দোলনের একজন প্রধান ও প্রথম দিকের একনিষ্ঠ কর্মী আবুল কাশেম সন্দ্বীপের প্রতি আ. ন. স. হাবীব ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান কর্মী। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা কর্মী ও শব্দ সৈনিক। স্বাধীনতার 'রজত জয়ন্তী' উদযাপনের প্রাক মুহূর্তে তিনি মারা যান সাভারের আনন্দপুরে। ভার্ক থেকে চলে আসার পর অনেক আশা ও পরিকল্পনা নিয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন গণসাহায্য সংস্থা (জিএসএস)-এ। সেই আশা আর পূরণ হয়নি।

সন্দ্বীপের যখন মৃত্যু হয় আমাদের দেশে তখন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন চলছিল। প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন চলার কারণে সন্দ্বীপকে সাভার থেকে ঢাকা এনে মৃত্যুর আগে তাঁর জীবন্ত একটা ওরাল হিস্ট্রি ডকুমেন্টারি করাও সম্ভব হয়নি। সন্দ্বীপের চলে যাওয়ার পর বাংলা একাডেমিতে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তৎকালীন মহাপরিচালক আবুল মনসুর মুহাম্মদ আবু মুসার ফোন পেয়ে আমি যোগ দিই। সেই শোকসভায় আমরা সামান্য ক'জন যোগ দিই। গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যালয় তখন লালমাটিয়ায়। ১ জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে 'আবুল কাশেম সন্দ্বীপ সাক্ষরতা পুরস্কার' বিষয়ক যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আ. ন. স. হাবীবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সেদিন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি জুরি বোর্ডও গঠিত হয়। সেই বোর্ডে বর্তমান লেখকও একজন সদস্য ছিলেন। জীবনের সত্য যে কত কঠিন, আজ মনে হচ্ছে আ. ন. স. হাবীবের জন্যও হয়ত এরকম একটি কমিটি গঠিত হতে পারে।

আ. ন. স. হাবীবের সঙ্গে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য 'চেতনা' প্রাইমারের কারিকুলাম তৈরি থেকে প্রাইমার রচনার সময় দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছি। আ. ন. স. হাবীবুর রহমান যখন 'প্রশিকা'য় তখন এই সংস্থার পাঠমালা প্রণয়নের সময় তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন পঞ্চম শ্রেণির জন্য তর্ক রচয়িতা ও সম্পাদক হিসেবে। ঐ বইয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম 'আফ্রিকার উপকথা'। তিনি অন্যদের সঙ্গে আমাকেও প্রশিকার নিজস্ব পল্লীনিবাস মানিকগঞ্জের কৈট্টায় নিয়ে গিয়েছিলেন, অপূর্ব সুন্দর এক পরিকল্পিত পল্লীনিবাস। প্রশিকার

উপদেষ্টা, কবি, কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হকও উপস্থিত ছিলেন। একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ড. শাহজাহান তপনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং আমি অতিথিশালায় পাশাপাশি কক্ষে ছিলাম। ভাবতে কষ্ট হয় আজ তাঁরা সবাই প্রয়াত।

আ. ন. স. হাবীবের নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখা শিক্ষা উপকরণও ছিল। তিনি সহজ ভাষায় 'মওলানা ভাসানী' নামে একটি ৮০ পৃষ্ঠার জীবনীও লিখেছিলেন। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ থেকে বইটি বেরিয়েছিল মার্চ ২০০০ সালে। এই বইয়ের লেখকের কথায়– 'মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দরিদ্র মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তিনি দরিদ্র মানুষকে তাদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষমতাবান দেখতে চেয়েছেন।' এই একটি কথাতেই আ. ন. স. হাবীবের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা বোঝা যায়।

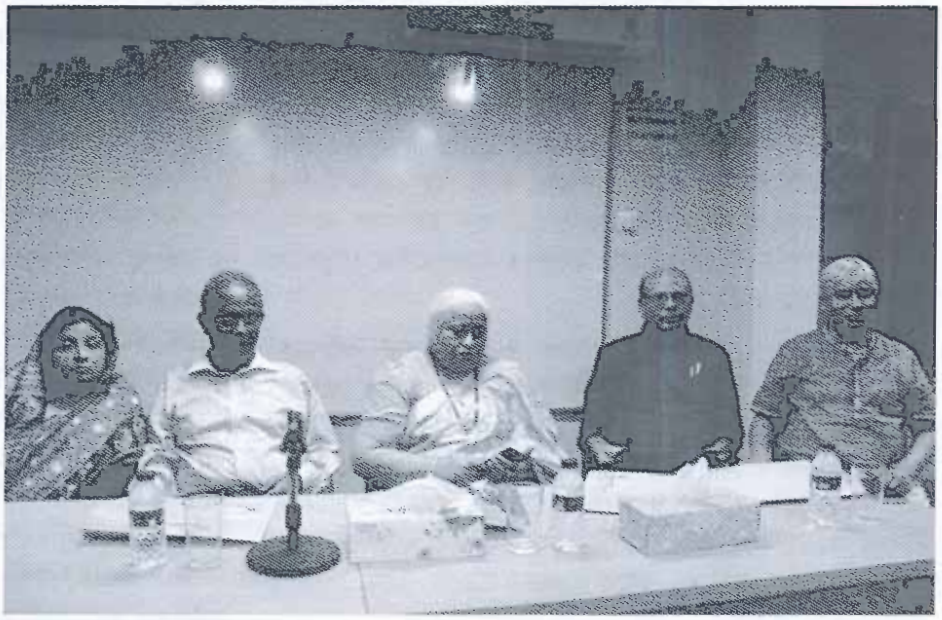

২০১৭ সালে আ. ন. স. হাবীবুর রহমানের 'ফিরে দেখা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তিন যুগ' শীর্ষক একটি অনতিদীর্ঘ স্মৃতিচারণমূলক, কোন কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তার মনোভাব, কখনো কখনো নানা কৌশল ও পদ্ধতি বিষয়েও তিনি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু কথা লিখেছেন। এ বইয়ের প্রথম লেখাটি হল– 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে আমার যাত্রা শুরু'। এই লেখায় তিনি বয়স্ক শিক্ষার কাজে সিলেটের খাদিমনগরে কীভাবে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়েছেন, সে-সব কথা অকপটে বলেছেন। তারপর তো অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় চলে গেলেন তা বলেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন, 'কীভাবে এসব প্রশিক্ষণে গ্রামীণ জ্ঞানের ব্যবহার করা যায়। গ্রামীণ জ্ঞান মানে তৃণমূলের প্রাকৃতজনের সামাজিক ধ্যান-ধারণা, ধর্মভাব ও মূল্যবোধ ইত্যাদি স্থানিকভাবে কাজে লাগিয়ে কীভাবে কার্যকর প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সেসব কথা তিনি তাঁর মতো করে বলেছেন। 'ফিরে দেখা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তিন যুগ' তাঁর ৪২টি লেখার সংকলন। এটা কোন কালানুক্রমিক সুপরিকল্পিত বিশ্লেষণধর্মী বই নয়, অনেকটা চলচ্চিত্রের বিভিন্ন স্পটের মতো টুকরো টুকরো স্মৃতিভাষ্য, নানা কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের প্রকাশ। তাঁর নানা ভাবনা ও সাম্প্রতিক সময়ের শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই, পাঠ্যবইয়ের ভুল, লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে এনসিটিবি'র বইয়ের পদ্ধতিগত ভুল নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন 'সাক্ষরতা বুলেটিন'-এ। প্রায়ই তাঁর লেখা চোখে পড়ত। এসব লেখা আগ্রহভরে পড়তাম তাঁর চিন্তাকে বুঝবার জন্য।

২০০৪ সালে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম শিক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ক শব্দাভিধান শিক্ষাকোষ প্রকাশিত হয় প্রধান সম্পাদক ম. হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে। সেই শিক্ষাকোষে তিনি অনেকগুলি ভুক্তি লেখেন, যেমন- অগ্রণী কর্মী (Advanced Worker), অগ্রণী শিক্ষার্থী (Advanced Learner), অনুসারক কার্যক্রম (Follow up Programme), আদর্শ ব্যক্তিত্ব (Ideal Personality) ইত্যাদি।

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান শ্যামলীতে একটি ফ্ল্যাট কেনেন ২০০১ বা ২০০২ সালে, সঠিক মনে নেই। তিনি এ দিনটিতে অনেক সহকর্মীকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু সেই আনন্দ অনুষ্ঠানে মূল কথা ছিল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সম্ভবত আমিই ছিলাম একমাত্র 'সরকারি' লোক। তাঁর বন্ধুদের অনেকেই ছিলেন আমার চেনা। জেমস জেনিংস তো ছিলেনই। তিনি সেদিন বলেছিলেন শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা মাঝে মধ্যে ওখানে মিলিত হব। আসলে আ. ন. স. হাবীবুর রহমান ছিলেন একজন জীবনভর শিক্ষার্থী। তিনি ছিলেন আজীবন এক সাক্ষরতাকর্মী। তিনি তৃণমূল মানুষের শিক্ষা সহায়ক সহচর। আমরা তাঁকে স্মরণ রাখব শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

প্রফেসর শফিউল আলম
প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ
প্রাক্তন পরিচালক, ব্যানবেইস, ঢাকা

ম. হাবিবুর রহমান

ইসিসিডি পরিচালন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

শিশুরা সকল দেশের জন্য অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদের বিকাশ ও যত্নের জন্য শিশুবান্ধব সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগ। এই উদ্যোগের পুরোধা হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ। এক্ষেত্রে নানাভাবে সহায়তা করতে পারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর জনসমাজ। বাংলাদেশ সরকার বৃহত্তর কার্যসেবা প্রদানের জন্য শিশুপ্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, জাতীয় শিশুনীতি, নারী নীতি ও শিশুশ্রম নিরসন নীতি প্রণয়ন করেছে। শিশুবান্ধব পরিবেশ ভিন্ন শিশুরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবে না, তাদের মুখে হাসি ফোঁটাতে পারবে না। পারবে না তাদের কাঙ্ক্ষিত মেধার বিকাশ ঘটাতে। এ প্রবন্ধটিতে সরকার বিশেষ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে নীতিগত পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে তা তুলে ধরা এবং তার সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক ও সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

যে কোন নীতি বাস্তবায়নের অনুসঙ্গ হিসেবে ৪টি প্রমাণক দলিল প্রস্তুত করতে হয়। প্রমাণক দলিলগুলো হলো- (১) নীতি পরিচালন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Operational and Implementation Plan), (২) ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন কৌশলপত্র (Systemic Change Strategy) (৩) আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan) ও (৪) আইনগত বিধি-বিধান প্রণয়ন (Developing a Legal Framework)।

ইসিসিডি নীতি পরিচালন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে যেখানে নীতি বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ১৫টি মন্ত্রণালয়ের ইসিসিডি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বর্তমান ও সম্ভাব্য কার্যসেবা চিহ্নিত করা হয়েছে। কার্যসেবাগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার দু'টি অংশ- একটি পরিচালন পরিকল্পনা ও অন্যটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা। পরিচালন পরিকল্পনায় ৮টি কর্ম বিষয়, ২৫টি কার্যসেবা এবং ৫৪টি করণীয় রয়েছে। এইসব করণীয়ের মধ্যে ৮টি ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে।

বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় ৭টি বিষয় ভাগ রয়েছে এবং এদের মধ্যে ১১১টি কৌশল রয়েছে। বিষয়ভাগ অনুযায়ী কৌশলগুলোর নামও সংখ্যা হলো: ৮.১ গর্ভ থেকে প্রসবকাল (১১টি), ৮.২ শিশুর বয়স জন্ম থেকে ৩ বছর (১৯টি), ৮.৩ শিশুর বয়স ৩ বছর থেকে ৬ বছর (২০টি), ৮.৪ শিশুর বয়স > ৬ থেকে ৮ বছর (২০টি), ৮.৫ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু (১৫টি), ৮.৬ অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শিশু (২০টি) এবং ৮.৭ দুর্যোগ-প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ের কার্যক্রম (৬টি)। এই কয়টি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ইসিসিডি নীতিমালার আওতায় ২৬৪টি করণীয় রয়েছে। এই করণীয়সমূহের মধ্যে প্রায় ২৩% কাজ এই অর্থবছর পর্যন্ত এগিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যান্যগুলি পরিচালন কৌশল বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

ব্যবস্থাগত পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তনের কৌশলপত্র প্রণয়ন সম্ভব। সমগ্র নীতিমালার আলোকে কোন আর্থিক পরিকল্পনা করা হয়নি। তবে আশা করা যাচ্ছে, ইসিসিডি কারিগরি কমিটির সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রণীত হবে। আইনগত বিধি-বিধান প্রণয়নে এখনও কোন সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পরিচালন পরিকল্পনায় ৮টি কর্মবিষয় যেমন প্রশিক্ষণ, সামাজিক-উদ্বুদ্ধকরণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় পরিকল্পনা, গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অর্থায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের মধ্যে ২৫টি কার্যসেবা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। পরিচালন কৌশলের সবগুলো করণীয় সঠিকভাবে সময়মত বাস্তবায়িত হলে ১৫টি মন্ত্রণালয়ে বন্টিত বাস্তবায়ন কৌশলের ১১১টি কার্যসেবাও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হবে। তবে পরিচালন পরিকল্পনার উপর্যুক্ত ৮টি কর্মবিষয়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কৌশল সর্বাগ্রে কার্যকর হলে অন্যান্য কর্ম বিষয় নিয়মানুসারে এগিয়ে যাবে। সেজন্য এই নিবন্ধে বাস্তবায়ন কৌশলের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য যেসব করণীয় রয়েছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হল (দ্রষ্টব্য: শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়; শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি: পরিচালন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ঢাকা ২০১৮):

১. শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ সার্বিক নীতি-নির্দেশনা দেবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদে সভাপতিত্ব করবেন।

২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় ইসিসিডি সমন্বয় কমিটি গঠন

করবে। এই কমিটি জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদে গৃহীত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বিষয়ে সুপারিশ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী জাতীয় ইসিসিডি সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যোগ্য ও তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি জাতীয় ইসিসিডি কারিগরি কমিটি গঠন করবে। এই কমিটি প্রধানত গুণগত মান বজায় রেখে ইসিসিডি নীতি দ্রুত বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কারিগরি পরামর্শ দেবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এই কমিটিতে সভাপতিত্ব করবেন।

৪. শিশুর সার্বিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ শিশু একাডেমীসহ অন্য দপ্তরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সার্বিক সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বাড়াবে।

৫. সরকার যথাসময়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীকে উন্নীতকরণের মাধ্যমে শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরে রূপান্তর অথবা একটি স্বতন্ত্র শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিশু বিকাশের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

৬. সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় শিশু বিষয়ক কেন্দ্র-ব্যক্তি (Focal Person) অথবা বিকল্প কেন্দ্র-ব্যক্তি নির্ধারণ করবে। সম্প্রতি কেন্দ্র-ব্যক্তির পরিবর্তে কেন্দ্র-ডেস্ক শনাক্তকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এসব কেন্দ্র-ডেস্ক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের শিশু বিকাশ বিষয়ক কর্মকাণ্ড সমন্বয় করে প্রতি তিন মাস পরপর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন পাঠাবে।

৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল প্রতিষ্ঠান তাদের বর্তমান অবকাঠামোর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে শিশু বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৮. সকল কার্যক্রমে সঠিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রশাসনিক ধাপে (যেমন-ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগে) কার্যরত শিশু বিষয়ক কমিটিগুলোকে ইসিসিডি কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়ে সক্রিয় করার উদ্যোগ নেবে।

উপর্যুক্ত পরিচালন ৮টি করণীয়ের মধ্যে ৪টির (১, ২, ৩ ও ৬) কার্যকারিতা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে চার বছর অতিবাহিত হয়েছে। এখন আরো ৪টি করণীয় কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি। এ ৪টির মধ্যে দুটো (৪ ও ৫) ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন (System Change) এবং বাকি দুটো (৭ ও ৮) সরকারি নির্দেশনার ওপর নির্ভর করছে। সে দিক থেকে ৪ ও ৫ করণীয় বাস্তবায়িত না হলে –

৪.১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসিসিডি সেল প্রতিষ্ঠিত হবে না;

৪.২ বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে একটি ইসিসিডি ইউনিট/সেল গঠিত হবে না;

৪.৩ সেল দুটিতে স্থায়ী জনবল পদায়ন ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না;

৪.৪ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় ইসিসিডি বিষয়ক কার্যসেবা শনাক্তকরণ ও সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান সম্ভব হবে না;

৫.১ শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা হবে না;

৫.২ শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরে একজন পরিচালকের নেতৃত্বেই ইসিসিডি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হবে না।

জাতিসংঘের বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যে এই প্রথমবারের মতো প্রারম্ভিক শিশু বিকাশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক অন্তর্ভুক্তির পেছনে রয়েছে মস্তিষ্ক গবেষণার বিস্ময়কর ফলাফল। এসব ফলাফলই নীতিনির্ধারকদের প্রারম্ভিক শিশু বিকাশের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ একটি রূপান্তরসূচক (Transformative) বৈশ্বিক এজেন্ডা। নানাদিক থেকে ইসিসিডি'র ওপর গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রারম্ভিক শৈশবের নানাবিধ অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে শিশুর জীবনভর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যবহারিক চরিত্র কী হবে তা নির্ধারণ করে।

৩ জন বিখ্যাত ব্যক্তি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে প্রারম্ভিক শিশু বিকাশের অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন:

- ইসিসিডি পরবর্তী ১৫ বছর বিশ্বে ইতিবাচক রূপান্তর ঘটানোর মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

  - বান কী মুন (প্রাক্তন মহাসচিব, জাতিসংঘ)

- ইসিসিডি'র পরিসরে বিনিয়োগ ব্যতীত লক্ষ লক্ষ শিশু একইভাবে দারিদ্র-চক্রের মধ্যেই জন্ম নেবে।

  - সাকিরা (ভুবনখ্যাত গায়িকা)

- শিশুরাই এসডিজি লক্ষ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

  - লুই ইয়ান দং (চীনের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান)

এ বিষয়ে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। সরকার এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ইসিসিডি নীতির ওপর প্রণীত পরিচালন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে এসডিজি-কে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য-৪.২ অভীষ্ট ১ (দারিদ্র দূরীকরণ), ২ (ক্ষুধা দূরীকরণ), ৩ (সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ) এবং ১৬ (শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ নির্মাণ) এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অন্যদিকে টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য-৪.২ এর দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে অভীষ্ট ৫ (জেন্ডার সমতা অর্জন), ৮ (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান), ১০ (নিজের দেশে ও অন্যান্য দেশে বৈষম্য হ্রাসকরণ), ১১ (আবাসভূমি হতে হবে নিরাপদ ও বাসযোগ্য), ১২ ভোগ ও উৎপাদন কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ) এবং ১৭ নং অভিলক্ষ্যে (বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব পুনরুজ্জীবিতকরণ)। আর বাকি ৬টি অভীষ্ট যেমন ৬ (পানির সহজ প্রাপ্তি ও পয়:নিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ), ৭ (টেকসই

আধুনিক শক্তি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ), ৯ (টেকসই শিল্পায়ন এবং নতুন উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষণ), ১৩ (জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি), ১৪ (সামুদ্রিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) এবং ১৫ (স্থায়িত্বশীল বন ব্যবস্থাপনা ও প্রাণিবৈচিত্র্য সংরক্ষণ) এর সঙ্গে ৪.২ অভিলক্ষ্যের সঙ্গে বহুদূরবর্তী সম্পর্ক বিরাজমান।

সারণী-১

টেকসই উন্নয়ন ৪.২ অভিলক্ষ্যের সঙ্গে অন্যান্য অভীষ্টের মানচিত্রায়ন

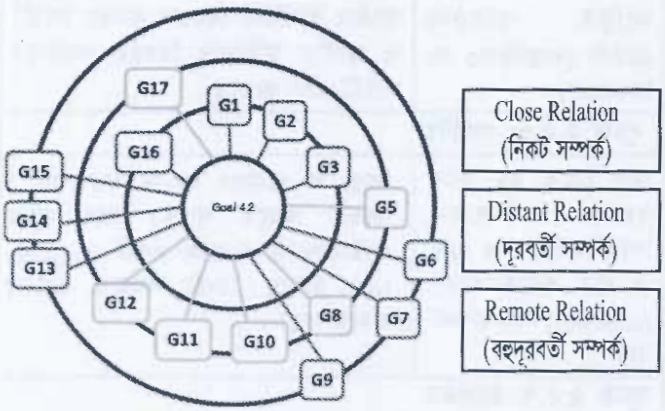

১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে ১৬৯টি অভিলক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪-এ রয়েছে ৭টি অভিলক্ষ্য এবং ৩টি বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪ হলো: সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিকর ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জীবনভর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। আর ৪.২ অভিলক্ষ্যটি হলো- ২০৩০ সালের মধ্যে ছেলেমেয়েরা মানসম্মত প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ, যত্ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি নিশ্চিত করবে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, শিক্ষার অনুক্রম অনুসারে অভিলক্ষ্য ৪.২ না হয়ে ৪.১ হওয়া উচিত ছিল। কেন এমনটি করা হয়েছে তা আমরা জানি না তবে বাংলাদেশে আমরা ৪.২-কে ৪.১ অভিলক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করতে পারি।

সার্বিক ইসিসিডি কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্যের মোট ৫টি সূচক রয়েছে। এই ৫টি সূচক ৩ ভাগে বিভক্ত (দ্রষ্টব্য: Education 2030: Incheon Declaration and and Framework for Action, December 2015)। এই ৫টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন ২টি সূচককে (৪.২.১ ও ৪.২.৩) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রহণ করেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০)-র আওতায় যে সব সূচক গৃহীত হয়েছে সেগুলো হলো-সব শিশুর জন্য ইপিআই টিকা, নিরাপদ শিশু জন্মদান, পিএনসি (পোষ্ট নাটাল চেকআপ) কার্যক্রম, পোলিও উচ্ছেদ, নবজাতকের হাম ও টিটেনাস নিরসন, জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম।

কিন্তু ৪.২ অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য সূচক ৪.২.২, ৪.২.৪ ও ৪.২.৫ বাস্তবায়নের জন্য এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। এখনই সময় পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত সূচকসমূহের বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেওয়া। টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য-৪.২ এ ৫টি সূচকের মধ্যে দু'টি প্রস্তুতি সংক্রান্ত, ২টি অংশগ্রহণ সম্পর্কিত আর শেষ ১টি বিধি-বিধানের সাথে জড়িত। ৪.২-এর প্রস্তুতি সংক্রান্ত সূচকে বলা হয়েছে লিঙ্গভেদে ৫ বছরের কমবয়সী মেয়ে ও ছেলে শিশুদের স্বাস্থ্য, শিখন ও মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ চেতনার দিকগুলো সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে কি না তা নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করার প্রস্তুতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বলা হয়েছে, এ সব শিশুদের বাড়িতে বিকাশোপযোগী ইতিবাচক ও উদ্দীপনাময় শিখন পরিবেশ বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব রয়েছে কিনা? ৪.২ সূচকে লিঙ্গভেদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির এক বছর পূর্বে সুসংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের আনুপাতিক হার কত এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তির মোট অনুপাত কত তা নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। সবশেষে বিধি-বিধান অংশে আইনি-কাঠামোর আওতায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাবর্ষের সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। ৪.২ এর সূচক ৪.২.১ ও ৪.২.২ এর চাইতে সূচক ৪.২.৩, ৪.২.৪ ও ৪.২.৫-এর অবস্থা অনেক ভালো। কেননা, এই তিনটি মূলত একটি মন্ত্রণালয়ে সীমাবদ্ধ আর বাকি সূচকসমূহ ১৪টি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে ইসিসিডিকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করানোর জন্য আরো ৪টি সূচকের প্রস্তাব করা হয়েছে।

দাপ্তরিক ৫টি অভিলক্ষ্যের বাইরে আরো ৪টি অভিলক্ষ্যের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ ইসিসিডির কার্যসেবার পরিধির ব্যাপকতা ও অধিক সংখ্যক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা। সামগ্রিক ইসিসিডি কার্যক্রমের অগ্রগতির ফলাফল নিরূপণের জন্য তা করা হয়েছে। ইসিসিডির ক্ষেত্রে গৃহীত দাপ্তরিক সূচক আগামী ১২ বছরের মধ্যে পরিপূরণ করে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করা যায়, কিন্তু তাতে দেশের পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটবে না।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের স্বার্থে দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য উপর্যুক্ত সম্পর্কের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সামগ্রিকভাবে শিশুর বিকাশ, সমতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি এবং কার্যসেবার মধ্যে একটি পরিধি-বিভাজন তৈরি হবে। সঠিকভাবে কার্যসেবার পরিধি বিভাজিত না হলে অভিলক্ষ্য ও সূচক নির্ধারণে দ্ব্যর্থকথা বা অস্পষ্টতা থেকে যাবে। সকল অংশীজনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আর সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সমবেত উদ্যোগ নিতে হবে।

সারণী-২

ইসিসিডি সংক্রান্ত গৃহীত ও প্রস্তাবিত সূচকসমূহের পরিস্থিতি

	বিবরণ	জাতীয়ভাবে করণীয়
সূচক ৪.২.১: প্রস্তুতি		
লিঙ্গভেদে ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের স্বাস্থ্য, শিখন ও মনস্তাত্তিক কল্যাণ চেতনা বিকাশের সঠিক অবস্থান	১০টি মন্ত্রণালয় যেমন মহিলা ও শিশুবিষয়ক ও পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, ধর্ম বিষয়ক এবং দুর্যোগ ও ত্রাণসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইসিসিডি নীতিতে প্রদত্ত কার্যসেবা নিরীক্ষণ করে পরিধি নির্ধারণ করবে। এ বিষয়ে সমন্বয় সংস্থা মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংস্থাসমূহের তথ্যাদি সংগ্রহ করবে এবং একটি তথ্য ব্যাংক তৈরি করবে।	
সূচক ৪.২.২: পরিকল্পনা		
৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের ইতিবাচক ও উদ্দীপনাময় পারিবারিক শিখন পরিবেশে বেড়ে ওঠার শতকরা হার	উপর্যুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ ইতিবাচক ও উদ্দীপনাময় পারিবারিক শিখন পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কার্যসেবা শনাক্ত করবে। এ কাজে জাতীয় ইসিসিডি কারিগরি কমিটি সহায়তা করতে পারে। তারা ইতিবাচক ও উদ্দীপনামূলক কার্যসেবার একটি মানসম্মত নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে পারে।	
সূচক ৪.২.৩: পরিকল্পনা		
লিঙ্গভেদে সুসংগঠিত শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণের আনুপাতিক হার অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য সরকার নির্ধারিত বয়সের ১ বছর পূর্বে	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে এসেছে। তবে এখনও ২০ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে, যাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে।	
সূচক ২.২.৪: অংশগ্রহণ		
১. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে এবং ২. প্রারম্ভিক শিশু শিক্ষা বিকাশের কেন্দ্র (০-৩) মোট ভর্তির অনুপাত	এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।	
সূচক ২.২.৫: বিধি-বিধান		
আইনী কাঠামোর আওতায় (১) অবৈতনিক (২) বাধ্যতামূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাবর্ষের সংখ্যা নির্ধারণ এবং (৩) পরিচালন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা (প্রস্তাবিত৩ নং উপসূচক)	সরকার প্রাথমিক শিক্ষাগামী সকল শিশুর জন্য এক বছর মেয়াদি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাবর্ষ নির্ধারণ করেছে। ইসিসিডি নীতিমালা অনুসারে শিশুদের জন্য শিশু বিষয়ক কার্যসেবা পরিচালনার জন্য শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করবে। জাতীয় ইসিসিডি বিষয়ক সমন্বয় কমিটি ও জাতীয় ইসিসিডি বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন করেছে।	
সূচক ২.২.৬: প্রস্তাবিত		
জন্ম থেকে ৪৮ মাস বয়সের শিশুদের সর্বজনীন বিকাশের ধরণ ও মাত্রা শনাক্তকরণের (screening) আনুপাতিক হার	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কাজটি করতে পারে। তবে সূচনা ফাউন্ডেশনের এ রকম একটি screening tool রয়েছে। সেটা সরকার ব্যবহার করতে পারে।	
সূচক ২.২.৭: প্রস্তাবিত		
বিকাশ-হ্রাসতা ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সুনির্দিষ্ট কার্যসেবার ফলে সংগঠিত বিকাশ উন্নয়নের আনুপাতিক হার	সর্বজনীন বিকাশের ধরণ ও মাত্রা নির্ধারণের পর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিকাশ-হ্রাসতা ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কার্যসেবা পর্যালোচনা করে কর্ম-উদ্যোগ নিতে পারে।	
সূচক ২.২.৮: প্রস্তাবিত		
উচ্চমানসম্মত ব্যয় সাশ্রয়ী ইসিসিডি নীতি কৌশলপত্র বা পরিকল্পনা প্রণয়ন	ইসিসিডি নীতি ২০১৩ সালে প্রণীত হয়েছে। ইসিসিডি বিষয়ক সমন্বিত পরিচালনা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।	
সূচক ২.২.৯ প্রস্তাবিত		
পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসিসিডি কার্যক্রমের বিনিয়োগ পরিস্থিতি (অভীষ্ট অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ ও তা পরিপূরণ হয়েছে)	এ বিষয়ে এখনও কোন সমন্বিত ইসিসিডি বাজেট প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।	

ম. হাবিবুর রহমান
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ
প্রধান সম্পাদক, শিক্ষাকোষ

আইনুন নাহার বেগম

একীভূত শিক্ষা: পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

পটভূমি

এক দশক আগেও মনে করা হতো যে, একীভূত শিক্ষা হচ্ছে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা যেখানে স্বাভাবিক শিশুদের পাশাপাশি একই শ্রেণিকক্ষে মৃদু থেকে মধ্যমানের প্রতিবন্ধকতার মাত্রা রয়েছে এমন শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। তখন একীভূত শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিকর শিক্ষা নামেও অভিহিত করা হতো। মনে করা হতো যে, সাধারণত ১৫/২০ জন স্বাভাবিক শিশুর শ্রেণিতে একজন করে প্রতিবন্ধী শিশু নিয়ে অন্তর্ভুক্তিকর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয় (সূত্র: শিক্ষাকোষ, ২০০৩)।

বর্তমানে একীভূত শিক্ষার ধারণা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক বিবর্তন সাধিত হয়েছে। একীভূত শিক্ষার একটি ভালো সংজ্ঞা হলো-

> Inclusive education is when all students, regardless of any challenges they may have are placed in age appropriate general education classes that are in their own neighborhood schools to receive high quality instruction, interventions and support that enable to meet success in the core curriculum (Quirk, Alma and Valenti, 2010; Alquaini and Gut, 2012).

একীভূত শিক্ষা দর্শনে কমিউনিটি বা এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশাল ভূমিকা স্বীকৃত। আধুনিক ধারণায় বলা হয়, একীভূত শিক্ষায় বিদ্যালয়ে এমন এক শিক্ষণ পরিবেশ থাকে যেখানে শিক্ষার সামগ্রিক আয়োজন ও সংগঠনে সমাজের একই বয়সী সব ধরনের স্কুলগামী শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সকল শিশু একই পটভূমিকায়, সমান গুরুত্বের সাথে শিক্ষা পাওয়ার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, একীভূত শিক্ষা তা নিশ্চিত করে।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা আর্থ-সামাজিক কারণে সকল শিশু একই রকম হয় না। পরিবারে শারীরিক, মানসিকভাবে কোনো কোনো শিশু বিশেষচাহিদাসম্পন্ন অর্থাৎ চ্যালেঞ্জিং শিশু থাকতে পারে, আবার সমাজে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের সন্তান রয়েছে। এমনিভাবে রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার, ভাষাগত ভিন্নতা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মানুষের বসবাস। শ্রেণিভিত্তিক সমাজের এই ভিন্নতাগুলো যাতে কোনো শিশুর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে না পারে সে বিষয়ে একীভূত শিক্ষা দর্শনের শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিতে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

একীভূত শিক্ষার বিশেষত্ব

একীভূত শিক্ষার বিশেষত্ব বহুমুখী। একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, আবিষ্কারের অনেক উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। তবুও ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত, যুদ্ধ, অবক্ষয়ের বিলাপ মানব সভ্যতায় সবসময়ই ছিল, বর্তমানেও আছে। তথাপি বিভিন্ন আবিষ্কার, উন্নয়ন প্রচেষ্টা সভ্যতাকে যুগে যুগে গতি ও প্রাণ সঞ্চার করে আসছে। অন্তর্নিহিত বিতর্ক ও কূটনৈতিক কৌশলগুলোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায়, মানবিকতার মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও সমস্যাপীড়িত মানবগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়ে আসছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)-২০৩০ তেমনি একটি উন্নয়ন প্রচেষ্টা যার ১৭টি অভীষ্ট রয়েছে। অভীষ্ট ৪ হলো- "Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all".

একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, SDGs এর চতুর্থ অভীষ্ট অর্জনে একীভূত শিক্ষা প্রভূত ভূমিকা রাখতে পারবে। কারণ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, শিক্ষা সব সময় একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণকে চরিতার্থ করার নিমিত্তে প্রণীত হয়ে এসেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের সকলে সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় না। আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা, কিছু বদ্ধমূল ধারণা, নারী শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক ও শারীরিকভাবেও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এরকম নানা বাস্তবতায় শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে ক্রমে বয়স্ক নিরক্ষর ও অনুৎপাদনশীল মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকে। আরেক দিকে শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর শিখন চাহিদা,

প্রয়োজন, ভালো লাগা, ইচ্ছা এবং শেখার গতি এইসব শিক্ষা-মনোস্তাত্ত্বিক বিষয়াদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া না। শুধু উপদেশমূলক ও যান্ত্রিক শিক্ষা কৌশল শিক্ষার মৌলিক অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। প্রচলিত শিক্ষায় শিশু শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নকে প্রাধান্য না দিয়ে বিষয়ভিত্তিক একাডেমিক অর্জন অর্থাৎ পরীক্ষায় পাশকে ভালো বা ভালো নয় এই মাপকাঠিতে বিচার করা হয়।

একীভূত শিক্ষার বিশেষত্ব এইখানে যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলোর বিপরীতে প্রতিটি শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। মানসম্মত শিক্ষা মানে হলো, যে শিক্ষা দ্বারা শিশুর বা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়, দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হয় এবং তার আলোকে দক্ষতা অর্জন করে আচরণের প্রকাশ ঘটে । এখানে উল্লেখ্য, একীভূত শিক্ষায় এটা বলা হয় না যে, সকল শিক্ষার্থীর সমানভাবে জ্ঞানীয়, দৃষ্টিভঙ্গিগত ও আচরণিক পরিবর্তন সাধিত হবে। এই দর্শনে যা বলা হয় তা হলো, প্রতিটি শিশু সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবে এবং তার উন্নয়ন ও পরিবর্তন হবে তার শিখন অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই। আধুনিক শিক্ষাদর্শনে বলা হয়, প্রতিটি শিশু শেখে তার নিজস্ব ইচ্ছা, পছন্দ ও চাহিদা অনুসারে। একীভূত শিক্ষা সেই কাজটি করে থাকে। যেখানে শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও প্রয়োজন এবং পছন্দের স্বীকৃতি থাকে। আর সে অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এখানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একীভূত শিক্ষার মূল পার্থক্য। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সমবেত শিক্ষণ প্রক্রিয়ায়, অপরদিকে একীভূত শিক্ষা পরিচালিত হয় প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রচলিত শিক্ষণ শিখন পদ্ধতিতে বিষয়কেন্দ্রিক পাঠনির্ভর পাঠ পরিচালনা পরিকল্পনা করা হয় কিন্তু একীভূত শিক্ষায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা অনুযায়ী পাঠ নির্ধারণ করে পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয়।

একীভূত শিক্ষার সর্বজনীনতা

প্রথমত, শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, জাতিসত্ত্বা, ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার, ভাষাগত অবস্থা ইত্যাদি কোনো কিছু শিশুর মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য অন্তরায় হয় না।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ, মেধাবী শিখনে সমানভাবে এগুতে পারে না এমন সব ধরনের শিশুই শিক্ষায় যুক্ত হতে পারে।

তৃতীয়ত, কর্মজীবী শিশুরাও শিক্ষাগ্রহণের সমান সুযোগ পেয়ে থাকে।

চতুর্থত, পথশিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে।

পঞ্চমত, শারীরিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জিং শিশুরা যাতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পরিবার-স্কুলে উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকে।

ষষ্ঠত, প্রশিক্ষিত, নিবেদিত, উদ্যোগী শিক্ষা প্রশাসক, সংগঠক ও শিক্ষকের নিশ্চয়তা থাকে।

সপ্তমত, ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় ভীতিহীন আনন্দদায়ক পরিবেশে শিশুর শেখার নিশ্চয়তা থাকে।

একীভূত শ্রেণির শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি

শিক্ষার বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাগত ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতে পারে। তবে শিক্ষার মূল বা মৌলিক উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে একই। যেমন, শিক্ষার্থীর জ্ঞানীয়, আচরণগত ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা। এজন্য দেখা যায়, একীভূত শিক্ষার শ্রেণি শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি, প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্নতর। শিক্ষার সমস্ত আয়োজনের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে শিক্ষার্থী আর শিক্ষার্থীর সাথে সরাসরি কাজ করেন শিক্ষক তথা বৃহত্তর অর্থে বিদ্যালয়। সুতরাং শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার সার্থকতা শ্রেণির পঠন পাঠন প্রক্রিয়ার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের একীভূত শিক্ষা দর্শনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এই মূল্যবোধে যে শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সমতা ও ন্যায্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। বিশ্বাস করতে হবে যে মনোবৈজ্ঞানিক দর্শনে প্রত্যেক শিশু তথা শিক্ষার্থী একক ও অনন্য। দায়বদ্ধ থাকতে হবে এই রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারে যে, প্রতিটি শিশুর অধিকার রয়েছে শিক্ষা গ্রহণের তা সে যে কোনো বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া যে কোনো গোষ্ঠীর বা সমাজের মানুষের সন্তান কিংবা যে কোনো ভাষাভাষী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের সন্তান হোক না কেন।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ শেখানো প্রক্রিয়া একীভূত শিক্ষার

উল্লেখযোগ্য ও অনিবার্য উপাদান। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা থাকে শিক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্র বিন্দুতে। কার্যক্রমের সমস্ত আয়োজন যেমন- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে শিখন শেখানো সামগ্রীর উন্নয়ন, শ্রেণির পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা সর্বত্র শিক্ষার্থীর গুরুত্ব ও প্রাধান্য স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে ভীতিহীন পরিবেশে শিক্ষার প্রতিটি কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্যকে স্বীকৃতি দেয়া ও বিবেচনায় আনা। ফলে শিক্ষার্থীরা জেনে বুঝে শিখনে আগ্রহী হয়ে অংশগ্রহণ করে। এভাবে তাদের শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর চিন্তা ও শিখন অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা হয়ে থাকে একজন সহযোগী বন্ধু ও সাহায্যকারীর। এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই হলো শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে আনন্দের সাথে সহজে শিক্ষার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা থাকে না। জ্যাঁ জাক রুশো, ফ্রেডারিক ফ্রায়বেল, জন ডিউই, রুডলফ স্টাইনার, জ্যঁ পিঁয়াজে, মেরিয়া মন্টেসরি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ দার্শনিকগণ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের গবেষণা পরিচালনা, তত্ত্বগুলো প্রচার ও বাস্তবায়ন করেছেন। বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষা ও শিশু উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে উল্লিখিত দার্শনিকগণের অনেক মতামত গ্রহণ করে আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

একীভূত শিক্ষা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। একীভূত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং তা সম্ভব হয় শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষক পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার ফলে।

একীভূত শিক্ষাকে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়। এ শিক্ষায় দলীয় কাজ, জুটিতে কাজ, আলোচনা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, আবিষ্কার পদ্ধতি, শিক্ষামূলক খেলা এধরনের ক্রিয়াশীল পদ্ধতি ব্যবহারের অবকাশ থাকে।

একীভূত শিক্ষায় একটি নমনীয় শিক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। শিক্ষা পদ্ধতি নমনীয় হওয়ার কারণে প্রয়োজনে শিক্ষাক্রমে অভিযোজন কৌশল ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম নীতির ভিত্তিতে প্রণীত আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম হচ্ছে দক্ষতাভিত্তিক। প্রান্তিক যোগ্যতা বা দক্ষতা যেভাবেই বলা হোক না কেন দু'টো বিষয়েরই অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সকল শিক্ষার্থী একই সময়ে শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত যোগ্যতা/দক্ষতা একই পরিমাণে অর্জন করবে তা বাস্তবসম্মত নয়। শিখন যোগ্যতা অর্জনে তারতম্য থাকবেই। আর এক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। কারণ একীভূত শিক্ষায় একই শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন শিখন স্তরের শিক্ষার্থী থাকে। একীভূত শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর উন্নয়ন করার জন্য যে পাঠ পরিকল্পনা করা হয় তা শিশুর শিখন যোগ্যতার উপর নির্ভর করেই করতে হয়। এজন্য শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় অভিযোজনের প্রয়োজন হয়।

প্রথমত, বিষয়বস্তু ও ধারণার আকার ও পরিমানের অভিযোজন করা প্রয়োজন হয় প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন স্তর অনুযায়ী।

দ্বিতীয়ত, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শ্রেণির বিভিন্ন কার্যক্রম, উপকরণ, সহ-উপকরণের ব্যবহার, বিন্যাস ও নির্বাচনে অভিযোজন প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, শ্রেণির কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনামূলক অভিযোজন প্রয়োজন এবং শিক্ষকের দ্বারা তাৎক্ষণিক উদ্দীপনামূলক অভিযোজনের প্রয়োজন হয় এবং শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবেও তা অবলম্বন করে থাকেন। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন যোগ্যতা অর্জনের মধ্যে সময়ের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

চতুর্থত, শিক্ষায় সব সময় সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানায়, মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারণায় যেতে হয়। একীভূত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন যোগ্যতায় ভিন্নতা থাকার কারণে বিষয়ের কাঠিন্য ও শিক্ষার্থীর শিখন যোগ্যতার এক ধরনের সমন্বয় সংগঠিত হয়। অর্থাৎ দক্ষতা বা যোগ্যতা অনুসারে কোনো বিষয়ের পাঠ নির্বাচন বা কী উপকরণ প্রয়োজন হবে তা পূর্বে নির্ধারণ করতে হয়।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন যোগ্যতাভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা একীভূত শিক্ষার কার্যকর অনুসঙ্গ। একীভূত শিক্ষাকে কার্যকর ও পাঠ পরিচালনার জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়ন সুচিন্তিত ও পদ্ধতিগত হয়ে থাকে। শ্রেণির শিক্ষণ কার্যক্রমের সময় শিক্ষক কী করবেন, শিক্ষার্থীরা কী করবে, কী ধরনের নির্দেশনামূলক কার্যক্রম থাকবে, শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং কত সময় ধরে শিখন শেখানো কার্যক্রম চলবে তার ধারাবাহিক প্রস্তুতিই হলো পাঠ পরিকল্পনা। পাঠ পরিকল্পনা লিখিত হতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনা বিষয়ে দুইটি মডেল বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয়। মডেল দুইটি হলো মরিসন পদ্ধতি ও হার্বার্টের পঞ্চসোপান। মরিসন পদ্ধতি পাঁচ স্তরে বিভক্ত। মানসিক ক্ষমতা ও বিষয় জ্ঞান পরীক্ষা, উপস্থাপন, আত্মীকরণ ও মূল্যায়ন, সমন্বয় সাধন

এবং মৌখিক বর্ণনা। হাবার্টের পঞ্চসোপানও পাঁচ স্তর বিশিষ্ট। প্রস্তুতি, উপস্থাপন, তুলনা, সাধারণ সূত্র নিরূপণ, প্রয়োগ ও অভিযোজন। বর্তমানে দ্বিতীয় মডেলটিকে তিনটি স্তরে সমন্বয় করে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন- প্রস্তুতি উপস্থাপন, মূল্যায়ন ও অভিযোজন।

পাঠ পরিকল্পনার সাথে মূল্যায়নের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। একীভূত শিক্ষায় যেহেতু শিক্ষার্থীদের শিখনের স্তরের মধ্যে ভিন্নতা আছে, তাই শ্রেণির পঠন পাঠন প্রক্রিয়া শুরু করার আগে শিখনের স্তর সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনের স্তর ও শিখন চাহিদা বোঝা যায়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনের স্তর ও শিখন চাহিদার প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শ্রেণির পাঠ পরিচালনার জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন। পাঠ পরিকল্পনা বার্ষিক, মাসিক/পাক্ষিক, দৈনিক ভিত্তিতে করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাসিক পাঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে দৈনিক পাঠ পরিচালিত হয়। একীভূত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিখন স্তরের জন্য এখানে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। আর এজন্য দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা করে শ্রেণির পাঠ পরিচালনা করা উত্তম। শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য কতকগুলো পর্যায় রয়েছে। যেমন-

- চলমান মূল্যায়ন- যা প্রতিদিন পাঠ শেষে ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে করা হয় এবং এ মূল্যায়নের কোনো রেকর্ড রাখা হয় না।
- পাক্ষিক/মাসিক মূল্যায়ন- নির্দিষ্ট সময় বা পাঠ শেষে এই মূল্যায়ন করা হয় এবং এই মূল্যায়নের রেকর্ড রাখা হয়।
- বার্ষিক মূল্যায়ন- এর রেকর্ড রাখা হয়।

একীভূত শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি সহজ ও ভীতিহীন। প্রতিদিনের শ্রেণির কাজের মতো আনন্দদায়ক। এখানে সংখ্যাভিত্তিক মূল্যায়নের চেয়ে বর্ণনামূলক বা গুণগত মূল্যায়নের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

একীভূত শিক্ষায় শ্রেণিতে মাল্টিগ্রেড মাল্টি লেভেল শিক্ষণ পদ্ধতি বেশি কার্যকর। কারণ মাল্টিগ্রেড শিক্ষণ পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রেড বা শ্রেণির শিক্ষার্থীর উপস্থিতি পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে বাস্তবতা হলো একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন যোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। কারণ সকল শিশু একইভাবে একই মাত্রায় শিখন শেখে না। তাই দেখা যেতে পারে, একই শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণির পাঠের শিখন অর্জন করেছে আর একজন শিক্ষার্থী প্রথম অধ্যায়ের শিখন অর্জন করেছে। আবার এরকমও হতে পারে যে একজন শিক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির শিখন যোগ্যতা অর্জন করলেও সে হয়তো গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণির যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। মাল্টিগ্রেড শিক্ষণ শিখন পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি বিষয়ের শিখন স্তর অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়ে থাকে।

একীভূত শিক্ষায় শিক্ষকের নিজস্ব মতামতের গুরুত্ব স্বীকৃত থাকে বলে শিক্ষকের দায়-দায়িত্বও অনেক বেশি থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত থাকে একীভূত শিক্ষায়। অভিভাবকগণের নিজ নিজ শিশু শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরিতে অংশ নিয়ে থাকেন।

শেষ কথা

একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে বিদ্যালয়, অভিভাবক, কমিউনিটি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা এবং এই শিক্ষাপদ্ধতির দর্শনের প্রতি বিশ্বাসের উপর। একীভূত শিক্ষাকে কার্যকর করার জন্য শ্রেণিকক্ষের শিখন শেখানো বিষয়ের সঙ্গে আরো কিছু বিষয় নিশ্চিত থাকতে হবে।

- সর্বোত্তম শিখন পরিবেশ;
- বিদ্যালয়ের সকল শিশুর শারীরিক সক্ষমতা মাথায় রেখে প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে;
- সকল শিক্ষার্থীর চলাচলে সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকতে হবে;
- খেলার জন্য প্রশস্ত মাঠ;
- পর্যাপ্ত আলো-বাতাস সুবিধাসম্পন্ন স্কুল বা শ্রেণিকক্ষ;
- শিক্ষা উপকরণ ও সহশিক্ষা উপকরণ দ্বারা সাজানো শ্রেণিকক্ষ;
- শিক্ষার্থীদের তৈরি জিনিস, অঙ্কন ও লেখাসমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষ;
- বিশুদ্ধ ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা;
- ব্যবহার উপযোগী টয়লেট সুবিধা।

একীভূত শিক্ষার শিক্ষকগণকে হতে হবে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ধৈর্য্যশীল, বন্ধুভাবাপন্ন ও আত্মবিশ্বাসী। স্থানীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় বলে তার গ্রহণযোগ্যতা বেশি থাকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের মানুষের কাছে। বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকেন, যিনি মিশুক ও উদ্যমী। অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজের সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকেন। নিয়মিত সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি তাদের অবগত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। অভিভাবকগণের আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হয় বিদ্যালয়ের প্রতি এবং প্রয়োজনে টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য ও মানসিকতা থাকতে হয়।

আইনুন নাহার বেগম
শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

মো. আব্দুল আজিজ মুন্সী

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ও বিশ্ব যুব দিবস

বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্দোলনে যুবসমাজের ভূমিকা অনেক সমৃদ্ধ। ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনে যুব সমাজের অবদান উল্লেখযোগ্য। জাতির উন্নয়ন, শান্তি, সম্প্রীতি ও অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করে যুব সমাজের উপর। তাদের উন্নত ও অর্থবহ সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালনের অনেক ইতিহাস আছে। দেশের যুবসম্প্রদায় সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কোটি তরুণ ও যুবক যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে, যারা দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ একটি সাহসী রূপকল্প গ্রহণ করেছে যা নির্দিষ্ট সময়ে অর্জন করতে সকল তরুণদের অংশগ্রহণ আবশ্যিক।

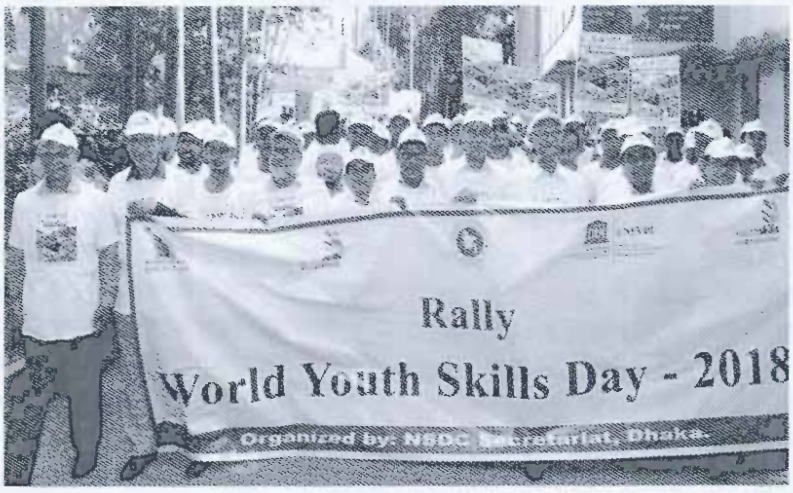

১৫ জুলাই 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস'। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব তথা মানবসম্পদ তৈরির বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালিত হয়। ২০১৪ সালে জাতিসংঘ ১৫ জুলাই দিনটিকে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ঘোষণা করে। ২০১৫ সাল থেকে আমাদের দেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এই দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করে আসছে। যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং কর্মকান্ডে যুবাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এই দিবস পালনের প্রধান উদ্দেশ্য।

২০১৮ সালের বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: ''দক্ষতা বদলে দেয় জীবন''। বেকারত্বের বেড়াজাল থেকে যুবকদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো দক্ষতা অর্জন। শিক্ষিত ও দক্ষ যুবসমাজ গড়ে উঠলে তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান করে নিতে পারে। তাই যুবসমাজের জন্য বর্তমান ও আগামী দিনের শ্রম বাজারের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের প্রতি জোর দিতে হবে। শুধু বিষয়ভিত্তিক দক্ষতাই নয় তার সাথে সাথে জীবন-দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০টি বিশেষ জীবন-দক্ষতা নির্ধারিত করেছে: আত্মসচেতনতা, সহমর্মিতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা, সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা, বিশ্লেষণমূলক সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা সমাধান দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ও চাপ মোকাবিলার দক্ষতা। এ সকল দক্ষতা জীবিকা অর্জন বা অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত নয় কিন্তু এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম যা আত্মস্থ করার মাধ্যমে দেশের যুবসমাজ দক্ষ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে কয়েকটি বিষয়ে জীবন-দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং অনেক শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিষয়গুলো তেমন গুরুত্ব পায় না। তাই বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার ঘাটতির সাথে সাথে জীবন-দক্ষতা ঘাটতির বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে যুবসমাজকে শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে হয়।

দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে সরকার ঘোষিত মধ্যম আয়ের দেশ

এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে যুবসমাজের দক্ষতা গুরুত্বসহ বিবেচনা করা দরকার। দেশে কারিগরি শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ২০১১ সালে আমাদের দেশে জাতীয় দক্ষতা নীতি প্রণীত হয়েছে এবং ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণীত হয়েছে। কিন্তু চলমান শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই দেশের তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে নাই।

যুব সমাজের একটি বড় অংশ গ্রামে বা প্রত্যন্ত এলাকায় এই সকল ক্ষুদ্র বা মাঝারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তাছাড়া শহর বা উপশহরে অবস্থিত বিভিন্ন শপিং মল, দোকান, হোটেলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক উঠতি বয়সী তরুণ কাজ করছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ যুববান্ধব বা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে তারা অতি সামান্য বেতনে কাজ করছে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমজীবীদের কিছুটা সুযোগ-সুবিধা থাকলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত যুবসম্প্রদায় আজও অবহেলিত। প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড বা বিভিন্ন কমিটি কাজ করে থাকে। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রম মজুরী নিয়ে কথা বলার সুযোগ এখনও গড়ে ওঠেনি।

আবার শিক্ষিত কিছু তরুণ প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে কাজ পায় না, কারণ নেই। ফলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের দেশে বর্তমান চাহিদার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন থেকে বিভিন্ন কারণে ঝরে পড়ছে এবং শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। যত শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় তার সকলেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারে না। প্রতিবছর যত শিক্ষার্থী এসএসসি পাশ করে তাদের সকলেই উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হতে পারে না। আবার যারা ভর্তি হয় তারা সকলেই কৃতকার্য হতে পারে না। একই অবস্থা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সকল পর্যায়ে দেখা যায়। যেমন এবছর মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় ২০,২৬,৫৭৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে ১৫ লাখ ৭৬ হাজার ১০৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু ২ লাখ ৬৮ হাজার ২২২ জন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার জন্য কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেনি (*বিডিনিউজ ২৪.কম*, মে ২৫, ২০১৮)। উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফলে দেখা যায় যে, মোট ১২ লাখ ৮৮ হাজার ৭৫৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮ লাখ ৫৮ হাজার ৮০১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। সে হিসেবে ৪ লাখ ২৯ হাজার ৯৫৫ জন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক এর চৌকাঠ অতিক্রম করতে পারেনি।

তাদের একটা অংশের শিক্ষাজীবন এখানেই শেষ হয়ে যায়। হয়ত তাদের বেশিরভাগই ঝরে পড়বে এবং একটা অংশ স্বল্প বেতনে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হবে। কারণ তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এভাবে প্রতি বছর শ্রম বাজারে আসা শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক বেকার অথবা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ২০১৫ সালের জরিপ অনুযায়ী, দেশে প্রায় ২৬ লাখ বেকার রয়েছে। যা দেশের মোট শ্রমশক্তির সাড়ে ৪ শতাংশ। তাদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ যুবক-যুবতী।

'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস' ছাড়াও দেশে প্রতিবছর বিশ্ব যুব দিবস পালন করা হয়ে থাকে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ঘোষণায় ১৯৯৯ সাল থেকে বিশ্ব যুব দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২০০০ সালের ১২ আগষ্ট থেকে 'বিশ্ব যুব দিবস' উদযাপিত হয়ে আসছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০-এর চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ, ষোড়শের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হলো যুব সমাজের উন্নয়ন ও সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান। আন্তর্জাতিক যুব দিবসে যুব সমাজের চাহিদাগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে যুবসমাজের অর্জনকে স্বীকৃতি জানাতে হবে। আমাদের দেশে বর্তমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ সালে প্রণীত হয়েছে এবং এই নীতির ভিত্তিতে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যের অধীনে ২০২০ সালের মধ্যে নিষ্ক্রিয় যুবকদের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। দেশে ইপিজেডের পাশাপাশি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে তার জন্য দক্ষ শ্রমশক্তির প্রয়োজন হবে। দেশের কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন এবং তাদের বিভিন্ন জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশে বর্তমানে কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ দশমিক ৫ শতাংশ কিশোর-কিশোরী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীরা কিশোর-কিশোরী। যদিও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যের জন্য মাথাপিছু সরকারি ব্যয় বছরে মাত্র ৮৬ পয়সা (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ জুলাই, ২০১৬)।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের অন্যতম বিষয় হলো দক্ষ মানব সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আজকের যুবক সমাজের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে দেশ আরও দ্রুত এগিয়ে যাবে। সরকারি বেসরকারিভাবে সকলের সমন্বিত উদ্যোগ বস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশের বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্বের হার কমানো সম্ভব যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ১. দারিদ্রতা থেকে মুক্তি, ৪. গুণগত শিক্ষা, ৮. যথোপযুক্ত চাকুরি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ৯. শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো, ১০. বৈষম্য হ্রাস অর্জনে সহায়তা করবে। ফলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে একটি শক্তিশালী মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

মো: আব্দুল আজিজ মুন্সী
উন্নয়ন কর্মী
ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাষ্ট্রি স্কিল্‌স কাউন্সিল (আইএসআইএসসি)

আশরাফুন নাহার মিষ্টি

প্রতিবন্ধী শিশু ও তার পরিচর্যা

আমাদের দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সম্পর্কে বর্তমানে সচেতন হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশিত হারে সচেতনতা বাড়েনি। আমাদের চিন্তা চেতনায় এখনও আমরা মধ্যযুগীয়। আমাদের আকর্ষণ আকাশচুম্বী; কিন্তু স্থায়ীত্ব? বিশেষত, ভালবাসার স্থায়িত্ব কম।

যারা সমাজকর্মে যুক্ত আছেন তারা, পেশাজীবী মানুষেরাও মাঝে মাঝেই হতাশাগ্রস্ত হন। সমাধান খুঁজে পেতে দেরি হয় অথবা সমাধান পাওয়া যায় না। মধ্যযুগীয় চিন্তার কথা বলছিলাম, কারণ এখনও প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য মা'কেই তার দায়ভার মৃত্যু অবধি বয়ে বেড়াতে হয়। পরিবারের পাশাপাশি, সমাজ ও রাষ্ট্র কারোরই যেন কিছু করার নেই। সবটাই মাকে বহন করতে হয়, খুবই কদাচিৎ বাবা সে যন্ত্রণা বহন করে। একটি শিশু সঠিকভাবে বিকশিত হতে না পারলে সে হয়ে ওঠে ছোট্ট টবে বনসাই হয়ে বেঁচে থাকা বটবৃক্ষের মতো।

এখনও আমাদের দেশের শিক্ষকরা, মননশীল লেখকরা এবং পরিকল্পনাবিদরা জানেন না মানব শিশু বিকশিত হতে না পারলে তাদের অপূর্ণতার দায় পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। আসুন দেখি, সেটা কিভাবে হতে পারে। একটি মানব শিশুর দায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কিভাবে নিতে হয়!

অপর্ণা তার ব্যক্তিগত জীবনে ভীষণ ব্যস্ত একজন মানুষ। তার ছেলেবেলা, কৈশোর ও তারুণ্যও কেটেছে ভীষণ প্রাণবন্তভাবে। প্রাথমিক হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কোণা তার পদচারণায় মুখরিত ছিলো। স্কুল ও ডিপার্টমেন্টে তাকে কেউ চিনবে না এমন হতেই পারে না। এমন উচ্ছল মেয়েটি উজ্জ্বল রেজাল্ট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পার করেই স্বামীর সাথে নতুন জীবনে পা দেয়। যে উচ্ছল জীবনের অধিকারী সে কি বসে থাকবে, নিশ্চয়ই নয়। সেটা হওয়াও উচিত নয়। জীবনতো অপূর্ণ থাকতে পারে না। শুরু হলো চাকুরির সাথে বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়ার উন্মাদনা! চাকুরি মানে তো বসে থাকা নয়, সংসার মানেও বসে থাকা নয়, দু'টি মিলে চষে বেড়ানো জীবনের প্রতিটি কোণা। কোন সময় নেই নিজের জন্য। সেটা অপর্ণা চায়ও না। কারণ সে মনে করে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যদি ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে দুনিয়া শাসন করতে পারেন তাহলে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা সময় ঘুম ও ব্যক্তিগত সকল কাজ করার জন্য যথেষ্ট। সকলেই তাকে নিয়ে খুশী, কর্মঠ কর্মী, করিৎকর্মা বৌ। পরিবারে এমন সদস্য পেলে কার না আনন্দ হয়? আনন্দ হয় অপর্ণারও, সকলে ভালবাসে তাকে, প্রয়োজনের সময় অনুভব করে। ঠিক যেন সব আগের মতোই কোন বদল নেই।

সন্তানসম্ভবা হলো অপর্ণা। নিজের প্রতি যথেষ্ট সময় সেই ছয় ঘন্টা। সমস্যা নেই কোন। ৯ মাস পেরুলে অফিসের সহকর্মীরা ঠেলে ঠুলে ও সার্ভিস রুলের যাঁতাকলে বাধ্যতামূলক ছুটি। সময় হলো নিজের দিকে তাকানোর। যতটা পরিবর্তন গর্ভবতী মা হিসেবে হওয়া দরকার তা হয়নি, কেউ খেয়ালও করেনি। যে সবার খেয়াল রাখে নিজের খেয়াল রাখার দায়িত্বও তার স্পষ্ট জবাব প্রিয় স্বামী ও তার বাড়ির সকলের। সহকর্মীদের মন্তব্য "এত বুদ্ধিমতী মেয়ে ও কেন আগেই বুঝল না সমস্যা আছে কোথাও?"

অপর্ণা একা হতে শুরু করলো এবং মনের শক্তিটাও নিস্তেজ হতে শুরু করলো। এমন কেন হবে, আমি তো কখনও কারও ক্ষতি করিনি, বিধাতা কেন আমাকে এমন শাস্তি দিবেন? এমন ভাগ্য হবে কেন আমার? পিছু ফেরার সময় তো নেই? বিধাতার কোন দোষ নেই, দোষ নেই কর্মফল বা ভাগ্যের। জীবন থেকে যে সময়টা চলে যায় সেটা নদীর স্রোতের মতো। সেটা ফেরত আসে না। দোষ হলো গর্ভকালীন সময়ে যে পরিচর্যা দরকার ছিলো সেটা হয়নি। সে দোষটা অপর্ণার নয়। প্রথম 'মা হওয়া', পূর্বে অভিজ্ঞতা না থাকা, উদাসীনতা সব যুক্ত হয়ে একটি আগামী শিশুর পথকে পিচ্ছিল করে দিয়েছে।

অপর্ণার যথারীতি একটি মেয়ে শিশু হলো। অপূর্ব সুন্দর তার মমতাময়ী মুখ। কিন্তু সে বহুমুখী প্রতিবন্ধিতার মুখোমুখি হয়ে জন্ম নিয়েছে। না সে কথা বলবে, না সে দেখবে। এখন? শ্রাবণের মেঘ যেমন থামে না, তেমন কান্না থামে না অপর্ণার। আরও তো বাকি আছে। সরলা বাঙালী ললনা সারা জীবন ঘরবার করেছে না? ওর জীবনতো এমনটি হবে বলেই জানতো সকলে। অপর্ণার মা ছাড়া বাকিরা ভবিষ্যৎ দেখেছিলো অনেক আগে। পরিবার সমাজের ভ্রুকুটি শুনে শূন্যমুখে অপর্ণার সত্যিকার জীবন শুরু হয়। প্রিয়তম স্বামী মেধার জোরে কয়েক মাসের মধ্যে চলে গেলো বিদেশে, তারপর না ফেরার বাহানায় ডিভোর্স। সুমতি অপর্ণার মেয়ে, সান্ত্বনা একটাই যে মায়ের চোখের জল বা কান্নার শব্দ কোনটাই তার কাছে পৌঁছে

না। যে পরিবার সমাজ, সংগঠন ও সংস্কৃতির জন্য অপর্ণার ছুটে চলা, তা অবশেষে বন্ধ হলো। অপর্ণার কোথাও যাওয়া হয় না। কারণ সুমতিকে কেউ ভালভাবে নেয় না। যে শিশুটি সমাজে সমান আদরের হবে, শুধু দেখতে না পারা বা কথা বলতে না পারার কারণে সেই সুমতিকে কেউ দেখলেও আদর করে না। বরঞ্চ দূরে যেয়ে সমলোচনা করে অপর্ণাকে নিয়ে। কত আর কাঁদা যায়, কতই বা দুঃখ ভাগ করে নেয়া যায় বন্ধুদের সাথে, বন্ধুদের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় জনা ২ বা ৩ এসে থেমেছে। থেমে গেছে অপর্ণার জীবনও।

নতুন করে বাঁচতে হবে, কিন্তু পারছে না। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র তা হতে দিচ্ছে না। পরিবার তো আরো আগে ফেলে গেছে। এই অপর্ণা যদি ভবঘুরে হয়! সন্তানের ও নিজের বেঁচে থাকার তাড়নায় যদি পথে নেমে বাঁকে বাঁকে হাত পাততে থাকে? কি হবে? যদি অফিসের বড় বস, অফিসের পিয়ন অথবা দারোয়ান দেখে অপর্ণা হাত পেতে আছে, কোলে তার ফুটফুটে পরী যে দেখেও না কথাও বলে না। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর, সহপাঠী, বন্ধু, সাংস্কৃতিক দলের সাথী ও সহকর্মী আবিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকস ছাত্রী ডিপার্টমেন্টে যাকে চেনো না এমন কেউ নেই, বিসিএস এ প্রস্তুতি নেওয়া মেধাবী লড়াকু মেয়েটি ও দুর্দান্ত সহকর্মী তার সব কাজ ফেলে অসহায় ছিন্নমূল, আশ্রয়হীন ক্লান্ত ভবঘুরে?

হয়তো মুখ ফিরিয়ে না দেখার ভান করে চলে যাওয়া যাবে। হয়তো বা চোখাচোখি হয়ে গেলে একটু সাহায্য বা সহানুভূতি দেখাবে। তাতে কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবারের দায় কমে না। কেন না শুধুমাত্র একটি প্রতিবন্ধী সন্তানের পরিচর্যার ব্যবস্থা না থাকায় অপর্ণার মতো একটি মেধাবী, লড়াকু প্রতিশ্রুতিশীল মানব পরাস্ত হয়ে গেলো। এটি আমাদের বর্তমানের অবস্থা। এই অবস্থা পাল্টাতে হবে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, নারীরাও ঘরে বাইরে সমানে কাজে যুক্ত হচ্ছে। যে কারণে অফিসগুলো, বিশেষত বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সবগুলোতে প্রায় ডে-কেয়ার সেন্টার হয়েছে। আমাদের খোঁজ নেওয়া দরকার হাতে গোনা যে কয়টি ডে-কেয়ার সেন্টার হয়েছে তার কোনটিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা রাখা আছে কি না ?

আমাদের দায়বদ্ধতা মূলত এসব জায়গায় যখন আমরা একটি শিশুর পরিচর্যার কথা বলছি তখন সে পরিচর্যার ব্যবস্থাটি সকল শিশুর জন্য হচ্ছে কিনা? ভাবছি না। ফলে যে সকল প্রতিবন্ধী শিশুর মায়েরা কর্মজীবী, তাদের জন্য বিকল্প তৈরি করতে না পারলে কর্ম ক্ষমতা বা দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছেন না। ফলে প্রতিষ্ঠান যেমন একজন কর্মী হারাচ্ছেন তেমনি রাষ্ট্রে একজন বেকার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

প্রি-প্রাইমারী স্কুল খুব বেশি দিন চালু হয়নি। যে প্রি-প্রাইমারী স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সেখানেও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না। ফলে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রি-প্রাইমারী শিক্ষার যে সুযোগ থাকার কথা ছিলো তা বন্ধ থাকায় পরিবার ও স্বজনের উপর চাপ পড়ছে। এই চাপটি প্রতিবন্ধী শিশুর উপরও প্রবল, ফলে তার বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স অনেকাংশে বেড়ে যাচ্ছে।

অপর্ণার মেয়ে সুমতি এই দু'টি ব্যবস্থার কোনটিই পাবে না। কারণ ব্যবস্থা যেমন নেই, তেমনই এখনও বাংলাদেশের পেশাজীবী শিক্ষক, নার্স, ডাক্তার, স্কুল সাইকোলজিস্ট এমন কি প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে কাজ করছেন এমন সংগঠনেরও এখনও ডেফ ব্লাইন্ড অর্থাৎ সুমতির মতো দৃষ্টি-বাক-শ্রবণ (বহুমুখী) সমস্যাগ্রস্ত মানুষদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই।

অপর্ণা সুমতিকে কোন শিশু বা বিনোদন পার্কে নিতে পারে না, বাসার পাশে কোন খেলার মাঠ নেই, মহল্লাতে যে পার্ক আছে সেটাতে হুইলচেয়ার ঢোকে না। সুমতিকে যখন বাইরে নিতে হয় যেহেতু সে দেখে না বা শুনে না সেহেতু তাকে হাঁটিয়ে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে অপর্ণা জানে না। কোন পেশাজীবী নেই যিনি এই বিষয়ে তাকে সাহায্য করতে পারে। অপর্ণা একান্তই নিজের মতো করে সুমতিকে মানুষ করছে। সুমতির নিজের পোষাক পরা, তার দৈনন্দিন কাজগুলো নিজে করা, খাবার নিজে খাওয়া এবং শিক্ষা অর্জনের কি উপায় হবে ভেবে পায় না অপর্ণা। এই শিশুটিকে বাঁচাতে হলে তাকে দেশের বাইরেই চলে যেতে হবে এমন একটি ধারণা অপর্ণার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বসছে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একজন মানুষের সামর্থ্য কতটা তলানিতে গিয়ে ঠেকে, সে কেবমলমাত্র ভুক্তিভোগীরা জানেন।

অথচ সুমতি তার জন্ম হতে স্বাভাবিক মৃত্যুর বয়স পর্যন্ত জীবনের সকল চাহিদা না হলেও নূন্যতম চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বেঁচে থাকবে, এটিই সকল বিবেকবান মানুষের চাওয়া হতে হবে। সুমতিকে কোন অন্ধকার গহ্বরে রেখে মা অপর্ণা নিজের জন্য সময় অথবা তার নিজের সম্ভাবনার জন্য ঘুরে দাঁড়াবে? অথচ রাষ্ট্র যদি প্রতিবন্ধী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত চলাচল ও বসবাসের নিশ্চয়তা তৈরি করতে পারতো, তাহলে সুমতির মতো মানুষের বেঁচে থাকার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হতো।

আমরা হেলেন কেলারের কথা জানি। সে মূক ও অন্ধ ছিলেন। তার বেড়ে উঠা সহজ না হলেও তার চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিলো পারিবারিক, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার করণে। আমাদের দেশেও একইভাবে ভাবতে হবে। উন্নত দেশের মতো হয়ে গেছি বললে হবে না। উন্নত হওয়ার সূচকগুলো তেরি করতে হবে, পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে। সেজন্য জীবনের প্রতিটি স্তরে অপ্রতিবন্ধী শিশুরা যেমন মিশে যেতে পারে, তেমনি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে হাসপাতাল ও গৃহভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ রাষ্ট্র ও পেশাজীবী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে।

আশরাফুন নাহার মিষ্টি
নির্বাহী পরিচালক
ওমেন উইথ ডিজএ্যবিলিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

মাছুম বিল্লাহ

মানসম্মত শিক্ষা বলতে আমরা কী বুঝি

'মানসম্মত শিক্ষা' প্রবচনটি আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে শুনতে পাই, কথায় কথায় আমরা বলি বর্তমানকালে আমরা শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষাদান করছি তা মানসম্মত নয়। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ঈর্ষণীয় পর্যায়ে গেলেও আমরা বলি, ফল ভালো হয়েছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আসলে মানসম্মত শিক্ষা কী? কী শিক্ষা গ্রহণ করলে বা কীভাবে গ্রহণ করলে শিক্ষাকে আমরা মানসম্মত বলবো সে বিষয়ে কিছু স্বতঃসিদ্ধ ধারণা থাকা দরকার।

বস্তুত, এক কথায় মানসম্মত শিক্ষা কী তা সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে হয়তো বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করবেন, তবে সকলের মতামতের ক্ষেত্রেই সাধারণ কিছু বিষয় থাকে। আর সেগুলোর মধ্য দিয়েই আমরা বলতে পারি মানসম্মত শিক্ষা আসলে কী। মূলত মানসম্মত শিক্ষা হচ্ছে একগুচ্ছ বিষয়, তার মধ্যে পাবলিক পরীক্ষার ফল একটিমাত্র অংশ। কাজেই পাবলিক পরীক্ষায় উচ্চতর গ্রেড পাওয়াকেই আমরা মানসম্মত শিক্ষা বলতে পারি না। মানসম্মত শিক্ষা মানে কি ক্যাডেট কলেজ, ভিকারুন নিসা, রাজউক, আইডিয়াল বা নটরডেমে পড়া? মানসম্মত শিক্ষা মানে কি জিপিএ-৫ পাওয়া কিংবা সব বিষয়ে এ প্লাস বা গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়া? মানসম্মত শিক্ষালয় মানে কি হোমওয়ার্ক দিয়ে শিক্ষার্থীদের সর্বদাই চাপের মধ্যে রাখা? মানসম্মত শিক্ষা মানে কি ঘন ঘন অভিভাবক সভা ডাকা?

আসলে যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আমরা খুব ভালো বা মানসম্মত শিক্ষালয় বলে থাকি সেগুলোর দিকে একটু তাকালে আসলে আমরা কী দেখতে পাই? এ প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু কোনো মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি করে না বা তৈরি করার যথাযথ পদ্ধতি তাদের নেই। তারা হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী বাছাই করে। বাছাই প্রক্রিয়াও কোনো ধরনের সৃজনশীলতা বা মেধা তৈরির কথা বলে না। শুধুমাত্র পাবলিক পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয় সেই আদলে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে তাদের বাছাই করা হয়। এভাবে বাছাই করার পর শুরু হয় একটির পর একটি পরীক্ষা, জোর করে প্রাইভেট পড়ানো, পড়াতে পড়াতে কোনো একটি বিষয়কে তেতো করে ফেলা হয়। তারপর পাবলিক পরীক্ষায় তারা অবতীর্ণ হয় যেখানে ঐসব বিষয়ই তারা দেখতে পায়। তাই পরীক্ষায় ভালো করে। সবাই বাহবা দেয়। শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল ও কলেজে যেসব বিষয় বারবার করে অনুশীলন করেছে, সেগুলোর ওপরই তাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তাদের পঠিত বিষয়ের বাইরে থেকে যদি কিছু আসে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই তা পারে না। কিন্তু তাদের সেভাবে প্রস্তুত করালে তারা কিন্তু পারতো। স্কুল-কলেজেগুলো সে ধরনের অনুশীলন করায় না, কারণ যদি পরীক্ষায় ভালো না করে। আর তারা তো নিশ্চিত যে, পরীক্ষায় বইয়ের বাইরে থেকে কিছুই আসবে না। এখন যেটাকে সৃজনশীল বলা হচ্ছে, তাতেও কিন্তু প্রকৃত সৃজনশীলতার অনুসরণ করা হয় না। বাজারে প্রাপ্ত গাইড বই থেকেই শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নেয় আর একই বিষয় কিন্তু পাবলিক পরীক্ষাগুলোতেও আসে, শিক্ষার্থীরা অনেক নম্বর পায়।

একজন শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণি পাস করার পর তার কতটুকু কী জানা উচিত? ২০১৫ সালের এক অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন যে, পঞ্চম শ্রেণি পাস করার পর আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী পড়তে পারে না, লিখতে পারে না, সাধারণ যোগ-বিয়োগও পারে না। অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর কিংবা এসএসসি পাস করার পর কোন বিষয় তাদের কতটুকু জানা উচিত– এ বিষয়গুলো যেমন সকল শিক্ষকের জানা উচিত তেমন শিক্ষার্থীদেরও। কিন্তু আমরা জানি পরীক্ষায় কী আসবে। আর পরীক্ষায় একই ধরনের প্রশ্ন বছরের পর বছর আসতে থাকে। সেই পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করেই আমরা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানকে বলে থাকি 'মানসম্মত'। কিন্তু আনন্দের মাধ্যমে সঠিক ধারণা দেওয়া, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো শ্রেণিকক্ষে নিশ্চিত করাটাও মানসম্মত শিক্ষাদানের মধ্যে পড়ে। একটি বিষয় শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া, মুখস্থ করানো, সঠিক ধারণা শিক্ষার্থীদের না দিয়ে মুখস্থ করানো ইত্যাদিই ঘটছে এবং পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অনেক নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আমরা কি বলবো যে, আমাদের শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে বা মানসম্মত শিক্ষা তাদের দেওয়া হচ্ছে?

আমরা আশা করবো যে, অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর একজন শিক্ষার্থী নিজ ভাষায় অর্থাৎ বাংলায় সুন্দর করে নিজ সম্পর্কে লিখতে পারবে, দরখাস্ত লিখতে পারবে, প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারবে। কিন্তু অনন্য ব্যতিক্রম ছাড়া অনেকেই পারে না।

গণিত বা বিজ্ঞান যে কোনো বিষয়েই হোক, প্রশ্ন সব সময় গতানুগতিক। এর বাইরে গেলেই শিক্ষার্থীরা আর পারছে না। গণিত একটু ভিন্ন অঙ্ক করে দিলেই আর পারে না। ইংরেজির ক্ষেত্রে ভয়াবহ অবস্থা। তাদের ইংরেজিতে কথা বলে যোগাযোগ করতে শেখানো হয় না, ইংরেজি শুনে বুঝতে পারার অনুশীলন করানো হয় না। নিজ থেকে কিছু লিখতে দিলে লিখতে পারে না, নিজ বইয়ের নির্দিষ্ট স্থানটুকু যেখান থেকে পরীক্ষায় আসবে সেটুকু ছাড়া বাইরের কিছু দিলে পড়ে বুঝতে পারে না। অথচ পরীক্ষায় ইংরেজিতে নম্বর পেয়ে যাচ্ছে আশি, নব্বই এবং একশর কাছাকাছি। এই অবস্থাই সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে যে, শিক্ষার্থীরা পাস করে যাচ্ছে, উচ্চতর গ্রেড পাচ্ছে কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা তারা পাচ্ছে না। একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা কী ধরনের শিক্ষা দিচ্ছি তা বোঝা যাবে। আমাদের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় সেগুলোর প্রশ্ন এরূপ– 'ঢাকার অপর নাম কি?' উত্তর : জাহাঙ্গীরনগর। এটি নিজের তৈরি করার কিছু নেই, যে মুখস্থ করবে সে জানবে, যে করবে না সে জানবে না। কিন্তু প্রশ্নটি যদি এরূপ হতো– 'ঢাকার অপর নাম জাহাঙ্গীরনগর কেন?' এটি বিশ্লেষণমূলক। শিক্ষার্থীদের চিন্তায় ফেলে দেবে। তাদের চিন্তন দক্ষতা বাড়বে, বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন শিক্ষার্থীরা দেখে না, তাদের এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুতও করা হয় না।

আবার যারা সত্যিকার অর্থে এই অবস্থার মধ্যেও বিজ্ঞান ও গণিতে ভালো করছে, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার কিংবা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ভালো বিষয়ে ভর্তি হচ্ছে, সেখানেও কৃতিত্বের সাথে পাস করছে। পাস করার পর আবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশের সরকারি চাকরিতে যোগদান করছে। যোগদান করার পর ডাক্তারদের উচিত সহানুভূতির সাথে রোগীদের সাথে কথা বলা কারণ চিকিৎসা শুধু রোগ নির্ণয় করে ওষুধ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রোগীকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখার জন্য তার সাথে ভালোভাবে কথা বলতে হয়, তার মনে সাহস জোগাতে হয়, তার কী হয়েছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের ডাক্তাররা কি তা করেন? কয়েক সেকেন্ড দেখার পরেই রোগীর সাথে কোনো ধরনের কথাবার্তা না বলেই একতরফাভাবে একটি প্রেসক্রিপশন লিখে দেন, অনেক ক্ষেত্রে তাদের হাতের লেখাও বোঝা যায় না। আমরা এখানেও বলতে পারি যে, ডাক্তার মানসম্মত শিক্ষা পাননি। বিভিন্ন পেশার কর্মকর্তারা জনগণের সেবক হওয়ার পরিবর্তে তাদের ভক্ষক, বস, মালিক ইত্যাদির ভূমিকায় নামেন। তার অর্থ হচ্ছে, তারা উপযুক্ত শিক্ষা পাননি। তারা যে দেশের এবং জনগণের সেবক তা তারা বুঝতে পারেন না অর্থাৎ তারা মানসম্মত শিক্ষা পাননি।

স্কুল-কলেজে পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের কিছু বাস্তব সামাজিক দক্ষতা অর্জন করতে হয়। যেমন বড়দের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয়, ছোটদের কীভাবে স্নেহ করতে হয়, অচেনা একজন মানুষকে কীভাবে সম্বোধন করতে হয় ইত্যাদিও মানসম্মত শিক্ষার আওতায় পড়ে। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষা বর্তমানে দিচ্ছি তা কতটা মানসম্মত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তির মাধ্যমেই তা বুঝা যায়। তিনি বলেছেন– 'শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তার ব্যবসায়, নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে।'

একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের মেধা আবিষ্কারের জন্য, তাদের প্রকৃত সৃজনশীলতা বের করার জন্য ভর্তি হওয়ার পর পরই বিদ্যালয়গুলো আয়োজন করতে পারে এক 'ট্যালেন্ট হান্ট' বা 'মেধা অন্বেষন' কার্যাবলী। আয়োজন করতে পারে, 'যার যা ভালো লাগে, যে যাতে মজা পাও, যে যা করতে চাও, তাই করো বিনা দ্বিধায়'– জাতীয় একটি কার্যক্রম। যদি বলা হয় 'তোমাদের মধ্য যারা নাটক করতে চাও তারা নাটকের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকো, তোমাদের বাংলা স্যার তোমাদের সহায়তা করবেন। যারা কবিতা আবৃত্তি করতে পারো তারা কবিতা আবৃত্তির জন্য প্রস্তুতি নাও। যারা গান গাইতে পারো তারা গানের জন্য প্রস্তুতি নাও। যারা গল্প লিখতে চাও বা পছন্দ করো তারা গল্প লেখা শুরু করে দাও।' এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন এক ধরনের আনন্দের সঞ্চার হবে, শিক্ষাভীতি ও পরীক্ষাভীতি দূর হবে, শিক্ষকদের সাথে আলাদা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এসবই হল কার্যকরী শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই বিদ্যালয়ে লাজুক থাকে, তাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা প্রতিভার খোঁজ তারা নিজেরাও জানে না। যার যতটুকু আছে তা প্রকাশ করার বা প্রস্ফুটিত করার কোনো সুযোগও তারা পায় না পরীক্ষার পড়া আর প্রাইভেট পড়ার চাপে। এ অবস্থায় শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সবাইকে উৎসাহিত করা এ ধরনের কোনো না কোনো কিছু করার জন্য। যখন একজন শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীর ভেতরে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে বের করে নিয়ে আসতে পারবেন সেটিই শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রকৃত সার্থকতা।

স্কুল আবিষ্কার করবে কোন শিক্ষার্থী কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, কার নাচের প্রতি ঝোঁক আছে ইত্যাদি। তারপর তাকে উৎসাহ প্রদান করা, প্র্যাকটিস করার সুযোগ করে দেওয়া, জনসমক্ষে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু এ বিষয়গুলো আমরা বিদ্যালয়ে একেবারেই চিন্তা করি না। চিন্তা করার আসলে অবকাশ নেই পাবলিক পরীক্ষা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে। বর্তমানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত হয়েও যেন হলো না। বিষয়টি নিয়ে ভাবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। শিশুরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল কিন্তু তা আর হলো না। অভিভাবকদের আবারও শিক্ষক, কোচিং আর প্রাইভেট নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য বাচ্চাদের চাপ দিতে হবে। এসব কারণেই অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের একাডেমিক বহির্ভূত কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করাতে উৎসাহিত তো করেনই না বরং নিরুৎসাহিত করেন।

মাছুম বিল্লাহ
ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত
সাবেক ক্যাডেট কলেজ ও রাজউক কলেজ শিক্ষক

গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি বাস্তবায়ন দাবি আহ্বান

গৃহশ্রমিকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নির্যাতন ও সহিংসতা বন্ধ, ন্যায্য মজুরি, ক্ষতিপূরণ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে গৃহশ্রমিক সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে বক্তারা বলেন, গৃহশ্রমিকের অধিকার মানবাধিকার; কিন্তু বর্তমানে এই অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকার ইতিমধ্যে গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ ঘোষণা করেছে। তবে এখন বিষয়টিকে আইনের সুরক্ষায় এনে গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতন প্রতিরোধ ও তাদের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার সময় এসেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, গৃহশ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ট্রেড ইউনিয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যদিও রাষ্ট্র সরাসরি এ দায়িত্ব পালন করে না। এর জন্য নানা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সমকাল ০১.০৭.২০১৮

সাক্ষরতার হার এক দশকে বেড়ে ৭৩ শতাংশ

শিক্ষা খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে গত ১০ বছরে। প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় শতভাগ, ঝরে পড়া কমেছে অনেকাংশেই। প্রাথমিকের এক কোটি ৩০ লাখ শিশু উপবৃত্তি পাচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও অর্জিত হয়েছে জেন্ডার সমতা। কারিগরি শিক্ষায় বর্তমানে শিক্ষার্থীর হার ১৪ শতাংশ। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় চার কোটি শিশু বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই পায়। সাক্ষরতার হার ১০ বছরে বেড়ে হয়েছে ৭৩ শতাংশ। শিক্ষা অবকাঠামোতেও বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এখন আগের মতো ভাঙা স্কুল-কলেজ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, বিনা মূল্যের বই, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিংসহ সরকারের নানা পদক্ষেপের সুফল মিলছে এখন। বিশেষ করে বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে যাওয়ায় শিক্ষার প্রতি সবার আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষ করে বেড়েছে মেয়েদের আগ্রহ। এ কারণে কমেছে বাল্যবিবাহ। কমেছে ঝরে পড়াও। শিক্ষাখাতে এত উন্নতির কারণেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তবে সামনের চ্যালেঞ্জ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন। এখন প্রয়োজন শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন।

জানা যায়, বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ৫১ শতাংশ আর ছেলেদের ৪৯ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অংশগ্রহণ মেয়েদো ৫৩ শতাংশ ও ছেলেদের ৪৭ শতাংশ। আগামী ছয়-সাত বছরের মধ্যেই উচ্চশিক্ষায়ও ছেলে-মেয়ে সমতা আসবে। শিক্ষাখাতে বিপ্লবের কারণেই এমডিজির লক্ষ্য পূরণে সরকারকে বেগ পেতে হয়নি। ২০০৯ সালে দেশের ৯ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে যেত না। এছাড়া ২০১৩ সালে একযোগে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে, যা বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অর্জন।

কালের কণ্ঠ ২৫.০৭.২০১৮

আসকের তথ্য

ছয় মাসে ৩৭৩ নারী শিশু হত্যা

চলতি বছরের ছয় মাসে ৮৫৬ শিশু বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে শিশু হত্যার ঘটনা ১৪৮টি। একই সময়ে হত্যার শিকার হয়েছে ২২৫ নারী, ধর্ষণের শিকার ৪২৭জন। নির্যাতনের শিকার হয়েছে সহস্রাধিক নারী। দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী-শিশু হত্যা এবং নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে দাবি করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। গতকাল নির্বাহী পরিচালক শীপা হাফিজ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ ও আসকের নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে আসক।

আসকের তথ্যানুযায়ী, ৬ মাসে ১৪৮ শিশু হত্যা ছাড়াও আত্মহত্যার ঘটনা ৫৮টি। রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে ১৫ শিশুর। নিখোঁজের পর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে আট জনের। যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ৫৮ নারী। এর মধ্যে যৌন হয়রানির কারণে আত্মহত্যা করেছেন তিনজন। ৫৭ নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৪ পুরুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়া হয়রানির শিকার হয়েছেন ৬৯ নারী-পুরুষ। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২০৪ নারী। এর মধ্যে ১৪৪জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে। পারিবারিক নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছেন ৩০ জন। এছাড়া শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৩০ নারী। এ ধরণের পরিস্থিতি জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে বলে আসকের দাবি।

সমকাল ০১.০৭.২০১৮

ছয় দিনে অসুস্থ ১২৮ শিক্ষক

স্বীকৃতি পাওয়া দেশের সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবিতে গতকাল শনিবার ষষ্ঠ দিনের মতো আমরণ অনশন করেছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। টানা অনশনের কারণে প্রতিদিনই অসুস্থ হওয়া শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় উত্তর পাশে তাদের এই কর্মসূচি চলছে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি গোলাম মাহমুদুন্নবী প্রথম আলোকে বলেন, ৬ দিনে মোট ১২৮ জন শিক্ষক অসুস্থ হয়েছেন। এর মধ্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিনয় ভূষণ রায়সহ ১০ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। গতকালও ৬ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এমপিওভুক্তির দাবিতে গত ১০ জুন থেকে প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান করে আসছিলেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে সরকার থেকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না দেওয়ায় ২৫ জুন থেকে তারা আমরণ অনশন শুরু করেছেন। সর্বশেষ ২০১০ সালে ১ হাজার ৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে স্বীকৃতি পাওয়া নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ২৪২টি।

প্রথম আলো ১.০৭.২০১৮

সমন্বিত শিক্ষা আইন

কোচিং ব্যবসা, নোট ও গাইড বই নিষিদ্ধই থাকছে

কোচিং ব্যবসাসহ নোট ও গাইড বই নিষিদ্ধই থাকছে প্রস্তাবিত সমন্বিত শিক্ষা আইনে। খসড়ায় অনেক কিছু সংযোজন-বিয়োজন হলেও এ বিষয়গুলো বেশ গুরুত্বের সঙ্গে রাখা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও আইনের খসড়া পরীক্ষায় গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভাপতি জাবেদ আহমেদ এ তথ্য জানান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আগের খসড়ায় যেভাবে কোচিং বন্ধসহ নোট ও গাইড বই নিষিদ্ধ ছিল, তা থাকছে সমন্বিত শিক্ষা আইনেও। গতকাল মঙ্গলবার আইনের খসড়া পরীক্ষায় গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির বৈঠক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়, শিক্ষা সংক্রান্ত যত আইন আছে, সব আইন সংযোজন করতে হবে আইনের খসড়ায়। অতিরিক্ত সচিব জাবেদ আহমেদ বলেন, মন্ত্রিসভার দেওয়া পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আমরা সব আইনকে সংযোজন করে খসড়া চূড়ান্ত করব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রস্তাবিত আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব আইন, বিধি, প্রবিধান ও রীতি রয়েছে, সেসব সমন্বয় করে আইন হবে।

বৈঠকে অংশ নেওয়া ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক বলেন, শিক্ষা সংক্রান্ত সব আইন সমন্বয় করে খসড়া চূড়ান্ত করতে তিন মাসেরও বেশি সময় লাগবে। বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, খসড়া চূড়ান্ত হলে তা যাবে মন্ত্রিসভায়। মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত অনুমোদন দিলে সংসদে যাবে। তত দিনে এ সরকারের মেয়াদ থাকছে না। গতকাল বৈঠকের পর অতিরিক্ত সচিব আরও বলেন, মন্ত্রিসভা বলেছে খসড়া আইনটি সম্পূর্ণ না। দেশে শিক্ষা সংক্রান্ত ৫০টির মতো আইন রয়েছে। যদি শিক্ষা আইন করতে হয়, তাহলে ওইসব আইনকে সমন্বয়, সংযোজন করতে হবে।

'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' অনুযায়ী ২০১১ সালে শিক্ষা আইন করার উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১২ সালে শিক্ষা আইনের প্রথম খসড়া তৈরি হয়। সংযোজন-বিয়োজন শেষে ২০১৩ সালের ৫ আগষ্ট জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়ে মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হলেও তিন দফা পর্যবেক্ষণ দিয়ে ফেরত পাঠায় মন্ত্রিসভা। শেষবার ১২টি পর্যবেক্ষণ দিয়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব আইন সমন্বয়, সংযোজনসহ নতুন করে সমন্বিত আইন করতে বলা হয়।

সমকাল ১১.০৭.২০১৮

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে সভা

অনেক অভিভাবক এখনো বিয়েকেই সমাধান ভাবেন

পড়াশোনা শেষ করে মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, এমন চিন্তা অনেক অভিভাবক এখনো করতে পারেন না। সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কারণে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই একমাত্র সমাধান বলে ধরে নেন তারা। আবার নানা কারণে মেয়েরাও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে ভয় পাচ্ছে। মেয়েদের মতামত ও সিদ্ধান্ত তেমন গুরুত্ব পায় না। এসব কারণে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত এক সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

'তারুণ্যের শক্তি: আমরাই পারি বাল্যবিবাহ রুখে দিতে' শীর্ষক এই সভা আয়োজন করে গার্লস নট ব্রাইডস বাংলাদেশ জোট। সভায় বক্তারা বলেন, পারিবারিক ও সামাজিক বাধা মোকাবেলা করা সম্ভব হলে বাল্যবিবাহ অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। গার্লস নট ব্রাইডস-এর সমন্বয়ক আন্না মিনজ বলেন, বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে। তবে যেসব এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি রয়েছে, সেখানকার অনেক অভিভাবক মেয়েকে অন্য এলাকায় নিয়ে গোপনে বিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম আলো ১৭.০৭.২০১৮

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ৫০০ কোটি টাকা অনুদান দেবে ইউএসএইড

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ৬ কোটি ডলার অনুদান দেবে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ইউএসএইড। স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৪) আওতায় বিশেষ শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধীদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অনুদানের এ অর্থ ব্যবহার করা হবে বলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সম্প্রতি ইআরডি, বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার ইউএসএইডের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়। বৈঠকে ৬ কোটি ডলার অনুদান সহায়তা দিতে সম্মতি জানায় সংস্থাটি। পরে ইআরডি সচিব কাজী শফিকুল ইসলামের কাছে পিইডিপি-৪ অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠিও দিয়েছে। এ অবস্থায় এ বিষয়ে সরকার ও ইউএসএইডের মধ্যে শিগগিরই একটি অনুদান চুক্তি সই হবে।

এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ৫ বছরে ব্যয় করা হবে ৪৪ হাজার ৬৫৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে ৩১ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা। বিদেশি সহায়তার মাধ্যমে ব্যয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা। কর্মসূচিতে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা জাইকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডিএফআইডি, অস্ট্রেলিয়ান এইড, কানাডিয়ান সিডা, সুইডশ সিডা ও ইউনিসেফ সহায়তা দেবে বলে জানা গেছে। গত মে মাসে এ কর্মসূচি রাজধানীর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদন পায়। চলতি অর্থবছর থেকে এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

সমকাল ১৫.০৭.২০১৮

আরও ১২ হাজার সহকারি শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট নিরসনে আরও ১২ হাজার সহকারি শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকার। পার্বত্য তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান বাদে অন্য জেলার জন্য সোমবার দরখাস্ত আহ্বান করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আগামীকাল ১ আগষ্ট সকাল সাড়ে ১০টা থেকে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত। অধিদপ্তর জানিয়েছে, নতুন নিয়োগবিধি হচ্ছে। যেখানে নারী ও পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে কমপক্ষে স্নাতক। তবে নতুন বিধি এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় এবার বর্তমান নিয়োগ বিধিমালা অনুসরণ করেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে নারী আবেদনকারীদের এইচএসসি বা সমান পাস এবং পুরুষের জন্য স্নাতক বা সমমান পাস রাখা হয়েছে।

জনকণ্ঠ ৩১.০৭.২০১৮

সরকারে যে-ই আসুক, পাঠ্যবই বিতরণ জানুয়ারির ১ তারিখেই

আসছে ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের প্রস্তুতির কারণে জানুয়ারিতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রম এবং নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য পিইসি, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে সর্তক নজর রাখার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, সরকারে যারাই আসুক, জানুয়ারির ১ তারিখে পাঠ্যবই বিতরণ নিশ্চিত করতেই হবে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত চতুর্থ অধিবেশনে তিনি এ কথা বলেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারও এতে অংশ নেন।

সভা থেকে বের হয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, এইচএসসি পরীক্ষা, বই বিতরণ বা বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা যে হয়, আমাদের প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে, এগুলোর ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন পড়ে। আমরা মনে করি, এবার তাদের সহযোগিতা ফলপ্রসূ হয়েছে।

তিনি বলেন, আগামীতেও নভেম্বরে জেডিসি-জেএসসি এবং পরে পিইসি পরীক্ষা হবে। এ সময়ে আমরা তাদের সহযোগিতা নেওয়ার জন্য কথা বলেছি। মন্ত্রী আরও বলেন, এখানে সরকারে কে আসবে, না আসবে-নির্ধারিত হবে হয়তো ডিসেম্বরের দিকে, তখন হয়তো নির্বাচন হবে। কিন্তু জানুয়ারি মাসে যাতে বই ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মতো পেতে পারে, তার জন্য আমরা এরই মধ্যে বই ছাপা শুরু করে দিয়েছি; পাঠানোও শুরু করে দিয়েছি। এই বইগুলো যেন জেলা প্রশাসকরা রাখেন এবং ঠিকমতো ব্যবস্থা নেন, সেটার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সমকাল ২৫.০৭.২০১৮

অভিযাত্রা প্রকল্পের সমন্বয় সভা

পিকেএসএফ এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৫-২৬ জুলাই ২০১৮। 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র মহাপরিচালক জনাব কে. এম. আবদুস সালাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর জেনারেল ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) জনাব রফিকুল ইসলাম ও ডেপুটি ম্যানেজার মো. আবুল বাশার।

সভার দ্বিতীয় দিনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। আরো উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব গোলাম তৌহিদ ও প্রকল্প কর্মকর্তা মো. গোলাম রাব্বানী। এছাড়াও 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অভিযানের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় অংশ নেন। কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মান বাড়ানোর জন্য অভিযাত্রা প্রকল্পের মাধ্যমে একটি মডেল তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি সফল হলে 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের কর্মএলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য মডেলটি সম্প্রসারণ করা হবে।

দুইদিনব্যাপী আয়োজিত এই সভায় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়।

উর্মিলা সরকার

বিভাগীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভা
এসডিজি'র লক্ষ্য-৪ অর্জনের পরিকল্পনা ও কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইউনেস্কো ঢাকা অফিস, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ আয়োজনে এসডিজি'র লক্ষ্য-৪ অর্জনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জন্য কৌশলগত খসড়া পরিকল্পনা তৈরিতে সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অভিযানের স্থানীয় সহযোগী সংগঠন আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে হোটেল সিটি ইন, খুলনায় বিভাগীয় পর্যায়ের এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার জনাব লোকমান হোসেন মিয়া, সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্রাক্তন সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব ফারুক হোসেন, বিভাগীয় উপ-পরিচালক জনাব মেহেরুন্নেছা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব রমেন্দ্রনাথ পোদ্দার। সভাপতিত্ব করেন ইসরাত জাহান, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার। সভায় আরো ছিলেন ইউনেস্কোর প্রতিনিধি শিরিন আক্তার, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন-এর প্রতিনিধি ফারহানা ইয়াসমিন জাহান, বেনবেইজের প্রতিনিধি মো. তরিকুল ইসলাম এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিনিধি কে.এম এনামুল হক ও মো. আব্দুর রউফ। সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, এস.এম.সি, অভিভাবক, এনজিও কর্মী, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকসহ মোট ৭৬ জন সভায় অংশ নেন। সহযোগী পরামর্শক জনাব জিয়া-উস সবুর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা ৭টি দলে বিভক্ত হয়ে এসডিজি লক্ষ্য ৪ অর্জনে কি করণীয় সে বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

মো. আব্দুর রউফ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ উপলক্ষে পরিবেশ মেলা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-এর উদ্যোগে ১৮-২৪ জুলাই ২০১৮ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার জন্য নির্ধারিত মাঠে পরিবেশ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। 'আসুন প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারও পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধন করেন।

সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় গণসাক্ষরতা অভিযান অংশ নেয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠনের পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনা (বই, ফ্লিপচার্ট, পোস্টার, ম্যানুয়াল, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন) স্টলে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়।

সাজনা আইউব

স্থানীয় পর্যায়ে 'কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়নে ২১টি ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র সদস্যদের জন্য দুইদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নের আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষক এবং ১ জন এসএমসি-র সদস্য বা শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যসহ ৩০ জন অংশগ্রহণকারী ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেছেন।

তারিখ	ইউনিয়ন	আয়োজক সংস্থা
২৭-২৮ জুন, ২০১৮	চান্দাইকোনা	ইউডিপিএস, সিরাজগঞ্জ
২৭-২৮ জুন, ২০১৮	চাকলা	এনডিপি, সিরাজগঞ্জ
২৭-২৮ জুন, ২০১৮	ঝাঐল	এনডিপি, সিরাজগঞ্জ
১-২ জুলাই, ২০১৮	জোতবানী	জিবিকে, দিনাজপুর
১-২ জুলাই, ২০১৮	তেঘড়িয়া	এসেড হবিগঞ্জ
২-৩ জুলাই, ২০১৮	আদমপুর	হিড বাংলাদেশ, মৌলভীবাজার
৪-৫ জুলাই, ২০১৮	চাচড়া	জিজেইউএস, ভোলা
৪-৫ জুলাই, ২০১৮	বিরিশিরি	সেরা, নেত্রকোনা
৫-৬ জুলাই, ২০১৮	আমঝুপি	মউক, মেহেরপুর
৫-৬ জুলাই, ২০১৮	কুতুবপুর	ডিবিএস, মেহেরপুর
৬-৭ জুলাই, ২০১৮	বোয়ালিয়া	বেডো, নওগা
৮-৯ জুলাই, ২০১৮	গঙ্গাপুর	জিজেইউএস, ভোলা
৮-৯ জুলাই, ২০১৮	মোনাখালী	পিএসকেএস, মেহেরপুর
৮-৯ জুলাই, ২০১৮	আসলামপুর	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা, ভোলা
১৪-১৫ জুলাই, ২০১৮	শরাফপুর	আশ্রয় ফাউন্ডেশন, খুলনা
১৫-১৬ জুলাই, ২০১৮	করগাও	এনডেভার, হবিগঞ্জ
১৬-১৭ জুলাই, ২০১৮	জলমা	উন্নয়ন, খুলনা
১৮-১৯ জুলাই, ২০১৮	ওয়াগগা	আইডিএফ, রাঙামাটি
২০ জুলাই, ২০১৮	সৈয়দপুর	ইপসা, চট্টগ্রাম
২২-২৩ জুলাই, ২০১৮	ভান্ডারপাড়া	উন্নয়ন, খুলনা
২৬-২৭ জুলাই, ২০১৮	পাচগাঁও	হীড বাংলাদেশ, মৌলভীবাজার

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সহকারি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে ওরিয়েন্টেশনে সেশন পরিচালনা করেছেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট ৬৩০জন অংশগ্রহণকারীর আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাজী আশিক এলাহী

এসডিজি'র লক্ষ্য-৪ অর্জনের পরিকল্পনা ও কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক কনসালটেশন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ইউনেস্কো ঢাকা অফিস, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ আয়োজনে-এসডিজি'র লক্ষ্য-৪ অর্জনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জন্য কৌশলগত খসড়া পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অভিযানের স্থানীয় সহযোগী সংগঠন আইডিয়া'র উদ্যোগে ২২ জুলাই ২০১৮ তারিখে সিলেটে হোটেল সুপ্রীম-এর সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ের এক কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়। শামছুদ্দোহা। উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা ৭টি দলে বিভক্ত হয়ে এসডিজি লক্ষ্য ৪ অর্জনে কি করণীয় সে বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদা কে. চৌধূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ডঃ মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো'র এডুকেশন প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট সুন লে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সিলেট বিভাগ, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা সিলেট বিভাগ আরো ছিলেন ইউনেস্কো ও গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিনিধি। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, এস.এম.সি সদস্য, অভিভাবক, এনজিও কর্মী, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকসহ মোট ৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে এসডিজি'র ১৭ টি লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার সংশ্লিষ্টতা এবং এসডিজি-

এসডিজি'র লক্ষ্য-৪ অর্জনের পরিকল্পনা ও কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক উপস্থাপনা করেন প্রধান পরামর্শক অবসরপ্রাপ্ত সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ ও সহযোগী কনসালটেন্ট জিয়া-উস সবুর। তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা করেন ব্যানবেইস-এর পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ড. সৈয়দ ৪ অর্জনে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। সভাপতির বক্তব্যে জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী এসডিজি'র লক্ষ্য-৪ অর্জনের পরিকল্পনা ও কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক-এর কর্মপ্রক্রিয়া তুলে ধরেন।

সামছুন নাহার কলি

বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানারকম রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই রোগ প্রাণঘাতীও হতে পারে। এই রোগের প্রকোপে বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিরা কর্মক্ষমতা হারাতে পারেন। এই দুই রোগের উৎস হল এডিস মশার কামড়। তাই এসকল রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার জন্ম ও বিস্তার প্রতিরোধে আমাদের করণীয়:

- বাড়ির আশে-পাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গল, জলাশয় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- বাড়ির ভেতরে ও চারপাশে যেকোন পাত্রে বা জায়গায় যেন তিন দিনের বেশি পানি জমে না থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে;
- ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন, অ্যাকুরিয়ামের নিচে ও ফুলের টবে যেন পানি জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ও এসব স্থান নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে;
- বাড়ির ভেতর/বাহির/ছাদ এবং আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় পাত্রসমূহ ধ্বংস করে ফেলতে হবে;
- এডিস মশা মূলত এমন বস্তুর মধ্যে ডিম পাড়ে যেখানে স্বচ্ছ পানি জমে থাকে। তাই ফুলদানি, অব্যহৃত কৌটা, ডাবের খোসা/নারকেলের মালা, ছোট-বড় কন্টেইনার, পরিত্যক্ত টায়ার, ব্যাটারির খোসা ইত্যাদি সরিয়ে রাখতে হবে;
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে;
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস করতে বা উল্টে রাখতে হবে;
- ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে হবে;
- রাত্রে বা দিনে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৯০ শ্রাবণ ১৪২৫ জুলাই ২০১৮

সম্পাদক

এই মাস থেকে আর একটি নতুন অর্থবছর শুরু হল। ৩০ জুন নিয়ম মোতাবেক নতুন অর্থবছরের ব্যয় বরাদ্দসহ বাজেট পাশ হয়েছে সংসদে। দেশে এখন মুদ্রিত ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের কল্যাণে একটা রমরমা সম্প্রচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তার প্রভাবে শিক্ষাবঞ্চিত রিক্সাওয়ালা বা গ্রামের কৃষকও না বুঝলেও জেনে গেছে জিডিপি বা প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় বাজেট প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত কিছু আবশ্যিক বিষয়। বাজেটের ক্রমবর্ধমান আকারের মধ্যে দেশের জনসংখ্যার অংশ হিসেবে দিনমজুরেরও যে গণ্যতা আছে, সেকথা সে না জানলেও কিছু যায় আসে না। সমাজের প্রভাবহীন যে অংশ দুর্বল জ্ঞান নিয়ে এইটুকু বোঝে যে, বাজেট পেশ করার পর থেকেই কিছু লোক আছে যারা এটাকে খুবই ভালো, আদর্শ ও দেশের উন্নয়নের জন্য অসাধারণ অর্থনৈতিক রূপরেখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বোচ্চ শব্দমাত্রায় হাততালি দিতে থাকবে। আবার অন্য একটা দল তাৎক্ষণিকভাবেই ঘোর নিন্দামন্দ করতে থাকবে, তাদের মতে এর দ্বারা দেশের-সমাজের-মানুষের উন্নতি হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, যারা এরা পাশ করেছেন এবং তাদের তাঁবেদাররাই শুধু এর দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায়ী নেতারা পানি না ছুঁয়ে মাছ ধরার দক্ষতা প্রদর্শনের অভিলাষে মৃদু কটুকাটব্যসহ প্রতি বছরই বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে থাকেন।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদের ছবি
ইন্টারনেট থেকে গৃহীত

আমরা, যারা শিক্ষা নিয়ে সঙ্গত কারণেই পক্ষপাতমূলকভাবে ভাবিত, তারা বাজেট প্রণয়নের আগে থেকেই জানিয়ে দিই, শিক্ষায় বাড়তি বরাদ্দ প্রয়োজন, আর সেই বরাদ্দের খাতগুলো যেন সুনির্দিষ্টভাবে এমন হয়, যাতে ভবিষ্যতের একটা পরিকল্পিত ও সুদক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখাকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। কিন্তু যে অগ্রাধিকার শিক্ষার প্রাপ্য, তার যথাযথ প্রতিফলন আমরা দুভার্গ্যজনকভাবে দেখতে পাই না। মনে পড়েছে, ২০১০ সালে যে শিক্ষানীতি সংসদে অনুমোদিত হয়, তার যে চূড়ান্ত খসড়াটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে শেষ দিকে একটা অধ্যায় ছিল 'শিক্ষায় অর্থায়ন' শিরোনামে। কিন্তু অনুমোদনের জন্য পেশ করা শিক্ষানীতিতে তা বর্জন করা হয়। যে বিবেচনাই এর নেপথ্যে কাজ করুক না কেন, এটা খুবই বোধগম্য যে, শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থায়নের বিষয়ে সরকারি প্রশাসন কোন লিখিত দায়বদ্ধতা নিতে অনাগ্রহী।

শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের ব্যয় ও ব্যবহার নিয়ে প্রতি বছরই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বহুমাত্রিক হিসেব-নিকেশ প্রদান করে থাকে। সরকারের মন্ত্রী, সাংসদবৃন্দ ও আমলারা যথারীতি নানান কৃতিত্ব দাবি করে থাকেন। তার অনেকটার জন্যই তারা বাহবা দাবি করতে পারেন। কিন্তু এমন একটা পরিসংখ্যান তো প্রতি বছর হাজির করা উচিত, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনসহ সরকারি ব্যয় কত, আর প্রাইভেট কোচিং, গাইডবই ক্রয়, স্কুলে বিভিন্ন খাতে ফি প্রদান, যাতায়াত ও ইউনিফর্মসহ ব্যক্তি/অভিভাবক পর্যায়ে কত টাকা ব্যয় হয়। দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও দ্বিগুণ সংখ্যক অত্যন্ত ব্যয়বহুল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, সে কী সুশিক্ষার স্বার্থে না কি অর্থনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের বাণিজ্যিক লালসা পূরণে? বাজেটে কি মানসম্মত শিক্ষার বিস্তারে ব্যয় বরাদ্দ থাকবে? এমন প্রশ্নের উত্তর চাই আমরা।

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৬৫ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ• ফোন: ৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২ মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org

Facebook page: https://www.facebook.com/campebd, Twitter: https://twitter.com/campebd

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8lBbGUuYku02mV12r_3lsg